উৎস মানুষ

৪৪তম বর্ষ • ৩য় সংখ্যা • জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪

সূচিপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| আমাদের কথা | | |
| হাত দেখানো (শেষ পর্ব) | দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল | ২ |
| রাসমণির মন্দির ও রামকৃষ্ণ | নিরঞ্জন ধর | ৪ |
| রবীন্দ্রনাথের ব্রাহ্মণবিদায় | আশীষ লাহিড়ী | ১০ |
| রামরাজ্য | দীপাবলী দেবরায় | ১২ |
| পরিবারের ভেতরে নারী | যশোধরা রায়চৌধুরী | ১৩ |
| খাদ্য অখাদ্য | অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় | ১৭ |
| বিজ্ঞানে নোবেল ও নারী | শঙ্কর ঘটক | ১৮ |
| জেনেরিক বনাম ব্র্যান্ডেড | ইন্দ্রনীল ঠাকুর | ২২ |
| ঠ্যালার নাম বাবা রামদেব | সমীরকুমার ঘোষ | ২৪ |
| শিশুর জন্য টিভি/মোবাইল | মোহিত রণদীপ | ২৬ |
| সুবর্ণরেখা নদীর মৎস্যজীবীরা | মৃন্ময় ঘোড়ই | ২৮ |
| অনুপম মিশ্র | সঞ্জয় অধিকারী | ৩১ |


রেজিস্টার্ড অফিস : বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক, কলকাতা- ৬৪

**কার্যালয় ঃ খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন বি ৪, এস - ৩, পোঃ- (আর) গোপালপুর নারায়ণপুর কলকাতা- ৭০০১৩৬**

**ফোন : ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৮৯০২৪১২২৯০/৮৭৭৭০৬৬৪৭২**

**ওয়েবসাইট:www.utsomanush.com/**

**ই-মেল: utsamanush1980@gmail.com**

**ফেসবুক:http://www.facebook.com/utsomanush/**

**ISSN 0971-5800/RN.37375/80**

# আমাদের কথা

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞানের ছড়াছড়ি, বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতিষের অনুপ্রবেশ, বেনারসের মতো এখানেও গঙ্গারতি চালু হল। এই বাংলার এক রস সাহিত্যিক সেই কবে বলেছিলেন— 'বিজ্ঞান কেবল বিজ্ঞানীর সম্পত্তি নয়। সাধারণ লোক আর বিজ্ঞানীর এইমাত্র প্রভেদ যে বিজ্ঞানীর সিদ্ধান্ত অধিকতর সূক্ষ্ম শৃঙ্খলিত ও ব্যাপক। আমরা সকলেই বিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করিয়া জীবন নির্বাহ করি। অগ্নিপক্ক দ্রব্য সহজে পরিপাক হয় এই সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া রন্ধন করি, দেহ-আবরণে শীতনিবারণ হয় এই তথ্য জানিয়া বস্ত্রধারণ করি।' [পরশুরাম গ্রন্থাবলী — প্রথম খণ্ড পৃ ২৩০]

গত ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হল। প্রতি বছর দিনটি আসে এবং চলেও যায়, পরিবেশ সুরক্ষা নিয়ে কিছু ভাল ভাল কথা শোনা যায়। সেখানেই ইতি। চিকিৎসকরা রকমারি রোগের মোকাবিলা করতে হিমশিম খাচ্ছেন। কারণ হিসেবে পরিবেশ দূষণ কাঠগড়ায়। গত মে মাসে 'রুমেল'-এর দাপটে এই শহরে ৫০০ গাছ পড়ে গেল। সরকারি হিসেবে তাই বলছে। কখনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়,কখনো উন্নয়ন—সবারই শত্রু যেন গাছ! এক সময় আকাশে শকুন উড়লে ধরা হত কাছেপিঠে কোথাও ভাগাড় রয়েছে কিংবা কোনো পশুর মৃতদেহ পড়ে আছে। শকুনের ঝাঁক সেসব সাফাই করে পরিবেশ রক্ষা করত। বিনা পয়সায় সেই 'সাফাই কর্মী'রা হঠাৎ ভ্যানিশ হয়ে গেল। বৈজ্ঞানিকরা কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখলেন পশুদের শরীরে ডাইক্লোফেনাক নামে যে অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশন দেওয়া হয় তার ফলে শকুনের মড়ক লেগে গিয়েছিল। মৃত পশুদের শরীরে থেকে যাওয়া ওই অ্যান্টিবায়োটিক শকুনের দেহে বিষক্রিয়া ঘটিয়ে তাদের সাফ করে দিয়েছে। শকুন না থাকাতে পরিবেশের ভারসাম্য বেশ খানিকটা নষ্ট হল। মৃত পশুদের অফুরন্ত জোগান পথ কুকুরের বংশ বৃদ্ধি করল। অর্থাৎ একটি প্রাণীর বিলুপ্তি নতুন সমস্যার সূত্রপাত ঘটালো। পরিবেশ শৃঙ্খলা বিনষ্ট হলে তাই হয়। মৌমাছির ক্ষেত্রে একই ঘটনা। আমরা জানি মৌমাছি পরাগমিলন ঘটিয়ে হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের উপকার করে চলেছে। কৃষি বৈচিত্র্যে মৌমাছির এই অবদানের কথা কমবেশি সবাই জানে। কিন্তু প্রকৃতিতে মৌমাছির সংখ্যা হ্রাস

নিয়ে পতঙ্গবিদরা রীতিমতো আতঙ্কিত। কৃষিতে অত্যধিক কীটনাশক প্রয়োগ মৌমাছির সংখ্যা হ্রাসের প্রধান কারণ। আমরা ভাবি ওসব বিজ্ঞানীদের ব্যাপার-স্যাপার; ওঁরাই সব সামলাবেন বলে হাত তুলে দিই। অ্যালবার্ট আইনস্টাইন-এর সতর্কীকরণ 'পৃথিবী থেকে মৌমাছিরা লুপ্ত হলে, বুঝতে হবে মানুষ আর বছর চারেক টিঁকবে' (If the bee disappeared off the surface of the globe, then man would have only four years of life left)। বহুদিন আগে করা তাঁর এই অতি মূল্যবান পরামর্শ আমরা উপেক্ষা করেছি। বিটি কটন বীজ নিয়ে বছর খানেক আগেও অনেক লেখালেখি হয়েছে, সেমিনার হয়েছে। কৃষিবিজ্ঞানীদের সতর্কীকরণ কানে তোলেনি কোনো সরকার। এই বীজ সবটাই বিদেশী কোম্পানির তৈরি। নানান প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাজারে নামার পর বিদর্ভ অঞ্চলের তুলো চাষিদের পথে বসিয়ে দিয়েছে। উৎপাদন যে হারে কমেছে তাতে আগামী দিনে বিদর্ভ অঞ্চলের তুলো চাষিদের আত্মহত্যার খবর ছাড়া আর কিছু শোনা যাবে না। প্রাকৃতিক বিপর্যয় নয়, এ এক মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয়। যা অনায়াসে ঠেকানো যেত।

১৯৮০, ঝাড়গ্রাম-এ তখন প্রায় ৪৫০০০ শাল গাছ। ১৯৮৮-তে বনাঞ্চল ২১ বর্গ কিলোমিটার থেকে কমে গিয়ে ৮-এ এসে ঠেকেছে। ২০০৬, স্থানীয় পৌরসভার বনাঞ্চল আরো কমে মাত্র ৩ বর্গ কিলোমিটারে এসে ঠেকেছে। আর শালগাছ ৪০০০-এ। প্রয়াত বিজ্ঞান কর্মী বিজন ষড়ঙ্গী ঝাড়গ্রাম-এর গাছ বাঁচাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। *টপ কোয়ার্ক* পত্রিকায় উনি সেসব লিখতেন। *উৎস মানুষ* পত্রিকার সঙ্গে বিজনের নিবিড় যোগাযোগ ছিল। বিজন যা শুরু করেছিলেন তার ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়েছে এটা বোঝা যায়।

*উৎস মানুষ* পত্রিকার প্রয়াত সম্পাদক অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর স্মরণে ২০০৯ সাল থেকে প্রতিবছর ওঁর প্রয়াণ মাসে 'অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা'র আয়োজন করা হয়। চতুর্দশ স্মারক বক্তৃতার বিষয়, অনুষ্ঠানের স্থান ইত্যাদি আগামী অক্টোবর-ডিসেম্বর২০২৪ সংখ্যায় ঘোষণা করা হবে। এবারের বক্তা অধ্যাপক পার্থপ্রতিম বিশ্বাস।

উমা

আহরণ

# হাত দেখানোর হাত থেকে

দীপেন্দ্রকুমার সান্যাল
( ১৯২৪- ১৯৬৬)

**শেষ পর্ব**

জ্যোতিষীদের আরেক শ্রেণী আছে যাদের কাছে পৃথিবীতে দাগ রেখে যাবার মত কোনো ঘটনা ঘটে যাবার পরই শুনবেন ও-ব্যাপার আগে থেকেই জানতেন। গান্ধী মারা যাবার খবর তাঁরা জানতেন, সুভাষ বোস পালানোর খবর, ১৫ই আগষ্ট, দাঙ্গা—সব। শুধু মুখে তাঁরা কাউকে বলেননি অশুভ খবর বলে। সুভাষ বোস কবে আসবেন সে সম্বন্ধে আমরা দু-হাজারবার শুনেছি কিন্তু তাঁর জীবনে যে একবার পলায়ন আছে এটা যদি বৃটীশরা জানতেন। ভাগ্যিস সেটা বলেনি। অন্তত গান্ধীজীর ক্ষেত্রে আগে থেকে জানলে এ-হত্যাকাণ্ড নিবারণ করা যেত না কি? আর আশ্চর্য, এতে বিশ্বাসও করে অনেক লোক। আরো শুনবেন জ্যোতিষ সম্বন্ধে নানান গাল-গল্প। কিন্তু সত্যি বুকে হাত দিয়ে বলুন দেখি এরকম কটা ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন? আমি ত আজ পর্যন্ত একটাও নয়। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখবেন, কেউ না। কেউ তাদের বলেছেন যে একটা বিরাট যোগ আছে তাদের ভাগ্যে যার জন্যে অমুক সালে তার এত উন্নতি হবে যে স্বর্গেও রাস্তা হবে তাদের নামে। এবং তাদের হাতে একটা এমন চিহ্ন আছে যা নাকি সচরাচর দেখা যায় না। আরে মশাই সকলেরই হাতে যদি একটা করে অসাধারণ চিহ্ন থাকবে ত পৃথিবীতে সাধারণ লোক হয়ে জন্মাবে কারা?

কিন্তু ভবিতব্য জানবার মধ্যে কৌতূহল নিবৃত্তি ছাড়া আর কি কোনো সত্যিই লাভ আছে? যদি এড়ানো সম্ভব হতো তাহলেও না হয় জেনে সুবিধে ছিল কিছু। কর্মফলে যদি বিশ্বাস করতে হয় তাহলে একথা ত ঠিকই যে কপালে যা আছে তার হাত থেকে রাজা ফকির কারুরই নিস্তার নেই। এবং যে-কথা আগেই লিখেছি যে আমাদের মানসিক জোর এতখানি নেই যে কোনো লোক না জেনেও যদি আমাদের কাউকে খারাপ কিছু ঘটবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করে ত তাতে কর্ণপাত না করতে পারি আমরা। এমনকি এই খারাপ ভবিষ্যদ্বাণী থেকে অনেকের জীবনে অকারণ বিপর্যয় ঘটানো অসম্ভব নয় একেবারে। যেমন নাকি হাতুড়ে ডাক্তারের আশ্বাসবাণী বা ভয় দেখানোতে একসময় মারা পড়ার ইতিহাস বিরল নয়। যা হবার তা যখন হবেই তখন যা করবার তা করে যাওয়াই ভাল।

তবে ফুটপাতের পাশে যারা পাখী দেখিয়ে, ছক কেটে, কপালে তিলক কেটে লোক ঠকায় তাদের ওপর আমার বিরূপ ভাব নেই কিন্তু, তারাই অসহ্য আমার কাছে যারা সব জেনে শুনেও এদের

কাছে হাত পাতে। দুশ্চরিত্র, মিথ্যাবাদী, গুলবাজ, দাম্ভিক, বড়লোক সকলের প্রতিই আমার সহানুভূতি হয়, হয় না শুধু বোকাদের ওপর (আমি নিজেও তার মধ্যে পড়ি বলে বোধ হয়) আর শিক্ষিত বোকা পৃথিবীর কলঙ্ক, প্লাষ্টিক এজে অচল। ভাল করে শিক্ষিত লোকেরা জানে যে ফুটপাতের তিলকধারীরা জ্যোতিষের কিছুই জানে না। তবুও হাত পাতবার বেলায় অগ্রগণ্য হলেন এঁরা। তবু যে এদের ঠকিয়ে কিছু লোকের অন্ন জুটছে, এর জন্যে এই বোকা সৃষ্টি করবার জন্যে বিধাতার কাছে আমি কৃতজ্ঞ, তাঁর এই তিলকধারীদের চেয়েও। আর বোকারা সবচেয়ে বেশী বড়লোকের ছেলে-পিলেদের মধ্যেই। এটাও সৌভাগ্যের কথা।

'ভৃগু' শুনবেন কাশীতে প্রত্যেক জ্যোতিষীর কাছেই আছে এবং এও শুনবেন আপনি যার কাছে গেছেন, একমাত্র তাঁর কাছেই আছে, বাকী সব প্রক্ষিপ্ত। নেপালেও শুনবেন পাওয়া যায়। এর মধ্যে কোনটা খাঁটি কোনটা ভেজাল তা ভগবানই জানেন, কিংবা ভগবানও জানেন না। ভৃগু সমস্ত রকম প্ল্যানেটের যোগাযোগে যতরকম সম্ভব পারমুটেশান—কম্বিনেশন সব করে ভাগ্য গণনা করে গেছেন, 'মন্দ' কাটাবার মন্ত্র দিয়েও গেছেন এবং তাঁর সেই পারমুটেশন—কম্বিনেশনের মধ্যে আপনি আমি সে, তুমি, তোমরা, তারা, আমরা সকলেই পড়ব (যদিও ভৃগু নাকি রাহু এবং কেতুর কম্বিনেশন ধরেননি)। সেই গণনার পাতা আসতে যেতে নাকি খোয়া যায় এবং অনেকের মতেই শুধুমাত্র সূচীপত্রটুকু পাওয়া যায়। সেই পাতা কটা থেকেই ভৃগু গণনা হয় আজকের দিনেও। এবং পাতার বাইরে পড়লেই গুল।

অনেকে বিজ্ঞাপন দেখে প্রশ্ন করেন যে এত লোক—এবং গণ্যমান্য লোকেরা যে সর্টিফিকেট দেন অমুক জ্যোতিষীর অমুক গণনা অব্যর্থ হয়েছে তাও কি অবিশ্বাস্য? না, অবিশ্বাস্য নয় কিন্তু লোক যত গণ্যমান্য হোকই না কেন, তাঁর কোন বিষয়ে জ্যোতিষী মহাশয় গণনা করে বলেছেন এবং তার কতটুকু ফলেছে এ-সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না এবং জানতেও চাই না, শুনেই ছুটে যাই। আমার আপত্তি এইখানেই। নিজের বুদ্ধির ওপর বিশ্বাস না রেখে শুধুমাত্র অপরের কথা শুনে দাঁড়কাকে নাক নিয়ে গেছে বলে দৌড়নোর মধ্যে আর যাই থাক বাঙালীবুদ্ধির পরিচয় নেই।

বড়লোক এবং যাদের হাতে প্রচুর সময় আছে তাদের একটা খেয়াল হিসেবে জ্যোতিষ আলোচনা বা জ্যোতিষ নিয়েও সময় কাটানো তেমন অনিরাপদ নয়। কিন্তু মধ্যবিত্ত লোক যখন জ্যোতিষ নিয়ে মাথাব্যথায় তখনই সেদিন কী ভয়ঙ্কর। কারণ হবি হিসেবে 'জ্যোতিষ কতটা' মারাত্মক জানিনে তবে সারাদিনের ধ্যানজ্ঞান যদি জ্যোতিষ হয় ত সাধারণ লোকের ক্ষেত্রে বুঝতে হবে তার মানসিক টিবি হয়েছে। মনের অপমৃত্যু না হলে কেউ কাজ না করে কপালের দোহাই দিয়ে বসে থাকে? অথচ মজা দেখবেন গরীবেরাই ঘোড়ারোগে আক্রান্ত হয় বেশী। কারণ হলো সময় যখন সর্বদিক দিয়ে খারাপ পড়ে তখন লোকে এই স্তোকবাক্যেও ভোলে যে সময় ভাল আসছে। পঁচিশ বচ্ছর পর্যন্ত যার জীবনে উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটল না, হাতে একটা পতাকা দেখা দিলেই তার সব বদলে যাবে একথা কি বিশ্বাস্য? বরং যুদ্ধ বাধলে সাধারণ লোক হঠাৎ বড়লোক হয়ে যায় লাখ লাখ সেফটিপিন বেচেই—কিন্তু শুধুমাত্র হাতের পতাকা দেখে চুপ করে বসে থাকলে হয় না। কিংবা বড়লোকের হঠাৎ পতন হয় হাতে সার্কেল দেখা দিলে ততটা নয় যতটা তার নিজের ভুল দম্ভে, অকারণ লোভের তাড়নায়। আগুনে হাত দিলে হয়ত সত্যিই সব সময়ে হাত পোড়ে না কিন্তু হাতুড়ে জ্যোতিষীর পাল্লায় পড়লে কপাল সত্যিই ভাঙে। যদি কোনদিনই সত্যি হাতের অসংখ্য রেখা পাঠকেও পড়তে পারে সে পড়বে হাতে তালুতে লেখা আছে: খবরদার হাত দেখিও না কারুর কাছে। এই যে রেখা দেখছ এ-হয়েছে ছোটবেলায় হাত মুঠো করতে এবং খুলতে খুলতে। আর হাত দেখার ব্যাপারে শেষ কথা হলো সেই রাজা আর রাজজ্যোতিষীর গল্প। জ্যোতিষীকে ডেকে রাজা বল্লেন : আমার আয়ু কত?

জ্যোতিষী বলে দিলে: বেশী নয়!

রাজা ফের প্রশ্ন করলেন: তোমার আয়ু কত?

জ্যোতিষী জবাব দিলে: আমার আয়ু আছে বহু বর্ষ।

রাজা বল্লেন, তথাস্তু। তারপর কোটালকে ডেকে বল্লেন: জ্যোতিষীর গর্দানটা নাও ত এখুনি। দেখি ওর আয়ু আমার চেয়ে বেশী কি কম?

এরপর জ্যোতিষীর গর্দান গেল কি থাকল জানি না, কিন্তু আমার কাছে জ্যোতিষ শাস্ত্রের গর্দান এই গল্পের সঙ্গে সঙ্গে গেল। এবং বোধ হয় আপনাদের কাছেও!

পুঃ—এর পরও যে সব অতি বুদ্ধিমান, অতি শিক্ষিতরা হাত দেখাবেই তারা যেন আমার কাছে আসে। আমার ফি যার কোনো কথাই আমি মেলাতে পারব না তার কাছে ৩২ টাকা। যার এক-আধটা কথা মিলে যাবে তার কাছে আট টাকা। সম্পূর্ণ নির্ভুল প্রমাণে আমি নিজেই পাঁচ হাজার টাকা দেব।

উমা

পুরোহিত থেকে অবতার/ পর্যায় ২

# রাসমণির মন্দির ও রামকৃষ্ণ

নিরঞ্জন ধর

গদাধরকে কেমন করে অবতার বানানো হলো তা আলোচনা করার আগে অবতারের ধারণাটির তাৎপর্য একটু বিচার করে দেখা দরকার। বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঈশ্বর যখন মনুষ্যকলেবর ধারণ করে স্বর্গ থেকে ধরাতলে 'অবতরণ' করেন তখন তাঁকে বলা হয় 'অবতার'। ঈশ্বরের ধারণার সঙ্গে তাঁর অবতারত্বের ধারণার একটা মৌল অসঙ্গতি আছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান এবং ইচ্ছামাত্রই তিনি তাঁর সকল অভীষ্ট সাধন করতে পারেন। সেক্ষেত্রে তাই কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য তাঁর মনুষ্যদেহ ধারণ করার আবশ্যকতা কোথায়? এর উত্তরে অবশ্য বলা হয়েছে, এটা হলো লীলাময়ের খেলা।

যাই হোক, ধর্মাচার্যদের প্রদত্ত সংজ্ঞানুযায়ী অবতার হলেন দ্বৈতসত্তাসম্পন্ন জীব অর্থাৎ একাধারে তিনি দেবতা এবং মানুষ। মানুষরূপে তিনি প্রাকৃত জগতের সমস্ত নিয়মকানুনের সম্পূর্ণ অধীন। এই সব প্রাকৃত নিয়ম অতিক্রম করে তার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। কিন্তু ঈশ্বর এক অতিপ্রাকৃত সত্তা। তিনি প্রাকৃত নিয়মকানুন লঙ্ঘন করতে তাঁর অভিপ্রেত কাজকর্ম চালিয়ে যান। কাজেই যে-অবতারের জীবনে যত বেশি অলৌকিকতার সমাবেশ তিনি তত বড় অবতার বলে স্বীকৃতি পেতে পারেন।

অবতারবাদের সমগ্র ধারণাটা অবশ্য মূলত একটা অন্ধবিশ্বাসের কথা, যুক্তি বা লজিকের কথা নয়। ভারতবর্ষের মতন অনগ্রসর দেশে জনসাধারণের অজ্ঞতা, কুসংস্কারাচ্ছন্নতা ও অলৌকিকতার প্রতি মোহ-র সুযোগ নিয়ে কিছু স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত ব্যক্তি সুবিধামতন অবতার তৈরি করেন। বস্তুত মানুষ খালি ঈশ্বরই সৃষ্টি করে না, তার মানবিক সংস্করণ অবতারও সৃষ্টি করে।

এখন আমরা আমাদের উক্ত মানদণ্ড রামকৃষ্ণের জীবনে প্রয়োগ করে দেখব, কেমন করে তিনি অবতার পদবাচ্য হলেন।

আমরা গত অধ্যায়ে দেখেছি, রাসমণির প্রতিষ্ঠিত মন্দির-জটের প্রধান পুরোহিতকে অবতার পর্যায়ে উন্নীত করার সঙ্গে একাধিক স্বার্থ জড়িত ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য হলো, কামারপুকুর অঞ্চলনিবাসী ও রাসমণির সেরেস্তায় কর্মরত মহেশ ভট্টাচার্য (মতান্তরে রামধন ঘোষ) রাসমণিকে এই কাজে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন বলে রাসমণি পুরস্কার স্বরূপ তাঁর জমিদারীর দেওয়ানের পদে তাঁকে অচিরে নিযুক্ত করেছিলেন।[১] আদিপর্বে একমাত্র জানবাজারের জমিদারবংশই ভরতারিণীর মন্দিরের পুরোহিতের সামাজিক ও ধর্মীয় মর্যাদা বৃদ্ধির কাজে উদ্যোগী ছিলেন। পরবর্তী স্তরে তাঁদের মতলব সিদ্ধির প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল রামকৃষ্ণের ভাগিনেয় হৃদয়রামের অর্থলালসা ও বৈষ্ণবদের এক ধর্মীয় সংস্কার।

নিজে মন্দিরের কর্মচারীর তালিকাভুক্ত না হওয়া অবধি শূদ্রাণীর মন্দির প্রতিষ্ঠা ও অন্নভোগ দেওয়ার বিরুদ্ধে সবচেয়ে জোরালো প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন মন্দির-জটের প্রধান পুরোহিত রামকুমারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর। এমনকি, তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্তৃক রাসমণির মন্দিরে পৌরোহিত্য গ্রহণের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিলেন। এ-সব বিষয়ে তাঁর গোঁড়ামি রাসমণির প্রতিপক্ষ ব্রাহ্মণ শিবিরকেও যেন ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

ঝামাপুকুরে এসে টোল খোলার পর রামকুমার গদাধরকে নিজের কাছে এনে রেখেছিলেন। কাজেই রাসমণির মন্দিরে নিযুক্ত হয়ে রামকুমার যখন দক্ষিণেশ্বরে চলে এলেন তখন ঝামাপুকুরে গদাধর নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন এবং দিন কয়েক পরে তিনি অনেকটা বাধ্য হয়েই দক্ষিণেশ্বরে এসে জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের সঙ্গে বাস করতে লাগলেন। এই সময়ও তিনি কোনো মন্দিরের প্রসাদী অন্ন গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। তবে এখন তিনি একটু নরম হয়ে মন্দির কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কাঁচা সিধা নিয়ে নিজে রেঁধে খেতে শুরু করলেন। প্রধান পুরোহিতের সহোদর ভাইয়ের এই নীরব প্রতিবাদ মন্দির-জটের শূদ্রাণী চরিত্রের দিকে বেশি করে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগল। গদাধরের উক্ত প্রতিবাদের ইতি ঘটাতে মথুরবাবু তাঁকে রাধাকান্ত মন্দিরের বেশকারী রূপে নিযুক্ত

করে তাঁকে একজন শূদ্রাণীর কর্মচারীতে পরিণত করলেন। এক শিবমূর্তি গড়ার মধ্যে গদাধরের নন্দনসত্তার পরিচয় পেয়ে মথুরমোহন হয়ত তাঁকে ঐ পদের উপযোগী বলে মনে করেছিলেন।

দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-জটে কাজ নেবার সঙ্গে সঙ্গে গদাধর কিন্তু তাঁর 'চরিত্র' হারালেন এবং এই সময়েই তিনি মন্দির থেকে প্রদত্ত প্রসাদী অন্ন খেতে লাগলেন। এর পরে গদাধরের ঘন ঘন পদোন্নতি ঘটতে থাকে। বেশকারীর পদ থেকে তিনি অবিলম্বে রাধাকান্ত মন্দিরের পূজকের পদ পেলেন। তারপর ভবতারিণী-মন্দিরের পূজারী রামকুমার যখন কিছুদিনের ছুটি নিয়ে দেশে গেলেন তখন তিনি সাময়িকভাবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্থলাভিষিক্ত হন এবং পরে দেশে রামকুমারের মৃত্যু হলে তিনি এই পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হন। রাধাকান্ত মন্দিরের পুরোহিতের অগ্রাধিকার (seniority) সেখানে উপেক্ষিত হয়েছিল।

এ-যাবৎকাল গদাধর যেভাবে পুরোহিতের কাজকর্ম চালিয়ে এসেছেন তা হলো একেবারে ছাঁচে ঢালা। অর্থাৎ শক্তিপূজা পদ্ধতির যে বর্ণনা শাস্ত্রাদিতে দেওয়া আছে এবং তার পাঠ তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতার কাছ থেকে নিয়েছিলেন তা যতখানি সম্ভব নিখুঁতভাবে অনুসরণ করতে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু কালীমন্দিরের পুরোহিত পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হবার কিছুকাল পর থেকেই তাঁর নিজস্ব একটা ধর্মীয় জীবন গড়ে উঠতে থাকে। গঙ্গাসাগর ও নীলাচল যাতায়াতের পথে যে-সব বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু স্বল্পকালের জন্য দক্ষিণেশ্বরে রাসমণির আশ্রয় নিতেন, তাঁদের নির্দেশে গদাধর তখন সাধন-ভজন শুরু করেন। অতিরিক্ত কৃচ্ছ্রসাধনার ফলে এই সময় তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে এবং তাঁর পক্ষে যথাযথভাবে পূজাপাঠ সম্পন্ন করা আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। স্বভাবতই তখন তাঁর কাজকর্ম একেবারে এলোমেলো হয়ে পড়ে।

লোকজনের যোগ্যতা বিচারে মথুরবাবু একজন অতি বিচক্ষণ বক্তি ছিলেন। মন্দিরের পুরোহিতের মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গদাইয়ের উপযোগিতা উপলব্ধি করতে তাই তাঁর এতটুকুও বিলম্ব হয় নি। মথুরমোহন যখন রাধাকান্ত মন্দিরে বেশকারীরর পদে গদাধরের নিযুক্তির প্রস্তাব রামকুমারের কাছে দিয়েছিলেন তখন জ্যেষ্ঠভ্রাতা এই বলে আপত্তি জানিয়েছিলেন যে, গদাধর কৈশোর থেকেই এক মূর্ছারোগের শিকার হয়েছে যার জন্য তার পক্ষে গ্রামের পাঠশালার পাঠও সাঙ্গ করা সম্ভব হয় নি।[২] শহরের প্রতিকূল ও স্নেহহীন পরিবেশে ঐ রোগ তখন দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং তার পক্ষে মন্দিরের কোনো দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়। রামকুমারের দরিদ্র-সংসারে কনিষ্ঠ ভাইয়ের আয়ের প্রয়োজন যথেষ্ট থাকলেও রামকুমারকে গদাধরের নিযুক্ততে বাধা দিতে হয়েছিল।

এখন, রামকুমার যে-কারণে গদাইকে কোনো দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত হবার সম্পূর্ণ অযোগ্য বলে বিবেচনা করেছিলেন, মথুরের চোখেও ঠিক সেই কারণ-ই মন্দির-জটের পক্ষে গদাধরের উপযোগিতাকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। এর কারণ হলো গদাধরের মূর্ছারোগ। প্রাচীন ও মধ্যযুগের পুঁথিপত্রে মূর্ছারোগের অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়। আজ আমরা জানি যে মূর্ছা হলো মানুষের স্নায়ুমণ্ডলীর এক ব্যাধি। কিন্তু সে-যুগের যাদুচিকিৎসকরা এই রোগকে একটা 'পবিত্র' রোগ বলে বিবেচনা করতেন, কারণ তাঁদের চোখে এটা ছিল একটা ঈশ্বরীয় আবেশ। এমনকি, কখনো কখনো মূর্ছারোগী পূজিত হতো ঈশ্বরের প্রতিভূরূপে। কাজেই মন্দির ও দেবতার গৌরববৃদ্ধির ব্যাপারে একজন মূর্ছারোগীর নিয়োগ যথেষ্ট সহায়ক হবে বলে মনে করে মথুরমোহন রামকুমারের আপত্তি অগ্রাহ্য করে গদাধরকে মন্দিরের কাজে নিযুক্ত করলেন।[৩] তবে 'সাবধানের মান নেই' এই প্রবাদবাক্য অনুসরণ করে তিনি প্রথমে গদাইকে নিযুক্ত করলেন রাধাকান্তের মন্দিরে বেশকারীর সামান্য পদে এবং পরে স্বল্প সময়ের মধ্যে ধাপে ধাপে কেমন করে তাঁর পদোন্নতি ঘটালেন তা আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি। আমরা আরো দেখেছি, কালীমন্দিরের পুরোহিতের পদটি খালি হলে রাধাকান্ত মন্দিরের পুরোহিত ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের অগ্রাধিকারের দাবি উপেক্ষা করেও গদাধরের পদোন্নতি ঘটানো হয়েছিল।

মস্তিষ্ক বিকৃতির দরুন গদাধরের এই সময়কার পুজো কিছু বিপর্যস্ত হয়ে পড়ায় তা মন্দির কর্মচারীদের মধ্যে একটা প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিল এবং এই নিয়ে তাঁরা মন্দির কর্তৃপক্ষের কাছেও নালিশ জানিয়েছিলেন।[৪] মথুরবাবু কিন্তু প্রথাবিরুদ্ধ পূজাপদ্ধতিতে গদাধরকেই সমর্থন জানিয়েছিলেন এবং প্রতিবাদী কর্মচারীদের ধমক দিয়ে মুখ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তিনি এই সময় রাসমণিকে গিয়ে জানালেন—'চমৎকার পুরোহিত পাওয়া গিয়েছে। দেবী শীঘ্রই এখন জাগ্রতা হবেন।' এ-কথার নির্গলিতার্থ হলো: দেবী এখন অচিরে জনগণের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবেন। বস্তুত গদাধরের তখনকার অবিন্যস্ত পুজো ও নিজেকে নিজের

পুজো ইত্যাদি ঘটনা জনগণের চোখে গদাধরকে একটা বিশিষ্টতা এনে দিয়েছে এবং এ পুরোহিত যে একজন সাধারণ পুরোহিতমাত্র নন তা এখন বেশ বোঝা যাচ্ছে। গদাধরকে অবতার বানানোর প্রস্তুতি-পর্ব এইভাবে শেষ হলো। বস্তুত মামুলি ধরনের পূজক দিয়ে জানবাজার জমিদার বংশের বিশেষ উদ্দেশ্যসিদ্ধি বেশি দূর হতো না। তাই মথুরমোহন ও রাসমণির মতন রক্ষণশীল ব্যক্তিরাও গদাধর বদ্ধ উন্মাদ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর এলোমেলো পুজোয় তাঁকে প্রশ্রয়ই দিয়ে এসেছিলেন বলেই মনে হয়।

১. অবতার বানানোর ভিত্তিপ্রস্তরের উপর এখন সৌধ নির্মাণকার্য শুরু হলো। এখন থেকে মথুরমোহন গদাধর সম্পর্কে নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচার করতে শুরু করলেন।

ক. এমন একটা কাহিনী হলো, একদিন মথুরমোহন যখন দক্ষিণেশ্বরে তাঁর কুঠিতে বসে ঘরের সামনের বারান্দায় গদাধরের পায়চারি লক্ষ্য করছিলেন তখন তিনি 'স্পষ্ট' দেখলেন, যখন গদাধর তাঁর কুঠির দিকে এগিয়ে আসছেন তখন তিনি কালী আর যখন উল্টো দিকে মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছেন তখন তিনি শিব। এই দেখাকে মথুরবাবুর 'দিব্য দর্শন' বলে উল্লিখিত হয়েছে। গদাধরের অবতারত্বের ধারণা এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে, যেহেতু উক্ত 'দর্শনে'র তাৎপর্য হলো মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবতা (শিবের বুকের উপর দণ্ডায়মানা কালীমূর্তি) আর সেখানকার পুরোহিত হলেন এক ও অভিন্ন শক্তি। এই সময় 'জীবন্ত দেবতাজ্ঞানে' মথুর তাঁকে পুজোও করেছিলেন।[৫]

খ. গদাধর সম্পর্কে মথুর বিশ্বাসের অপর একটি দিব্য দর্শনও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। একদিন ফিটনে গদাধরকে নিয়ে জানবাজারে যাবার পথে বরানগরের কাছে এসে একদল কীর্তনিয়ার সঙ্গে দেখা হলো এবং গাড়ি সংকীর্তন দলের মধ্য দিয়ে চলতে লাগল। গদাধরের বড় ইচ্ছে হলো, তিনি ঐ কীর্তন দলে যোগ দেন। মথুরমোহন তখন দেখলেন, হঠাৎ ভাবাবিষ্ট গদাধরের দেহ থেকে এক জ্যোতির্ময় মূর্তি বেরিয়ে এল ও কীর্তন দলে যোগ দিয়ে কীর্তন আরম্ভ করল। কিছুক্ষণ ঐভাবে নৃত্য করার পর সেই জ্যোর্তিয় মূর্তি আবার স্থূলদেহে ফিরে এল।[৬]

২. অন্য দিক থেকে অপর এক ব্যক্তির 'দিব্য দর্শন' অচিরে মথুরমোহনের তথাকথিত দর্শনের সঙ্গে যুক্ত হলো। এই ব্যক্তি হলেন গদাধরের ভাগিনেয় হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়—সংক্ষেপে হৃদু। গদাধরের পিসতুতো ভগিনী হেমাঙ্গিনী দেবীর পুত্র হৃদয়রাম কাজকর্মের সন্ধানে বর্ধমানে এসে বাসা বেঁধেছিলেন। কিন্তু কোথাও কিছু সুবিধা করে উঠতে পারছিলেন না। তারপর লোকমুখে যখন তিনি শুনলেন মামারা রাসমণির মন্দির-জটে সসম্মানে অবস্থান করছেন তখন একটি কোনো কাজ পাবার আশায় দক্ষিণেশ্বরে এসে মামাদের দ্বারস্থ হয়েছিলেন এবং মামাদের সুপারিশক্রমে এখানে একটা কাজও তাঁর অবিলম্বে জুটে গেল। গদাধরের একজন সহায়ক ও সেবকরূপে তিনি নিযুক্ত হলেন।

হৃদয়রাম মন্দিরে সরকারিভাবে গদাধরের সহায়ক নিযুক্ত হলেও গদাধরের জীবনের অলৌকিকতা প্রচারে তিনি বে-সরকারিভাবে মথুরবাবুকেও যথেষ্ট সাহায্য দিয়েছিলেন। বস্তুত ঐ অলৌকিকত্ব প্রচারের কাজে হৃদয় মুখুজ্জেও মথুর বিশ্বাসের চেয়ে কিছু কম আগ্রহী ছিলেন না, যদিও উভয়ের প্রচারকার্যের মধ্যে একটা নক্ষত্র-সুদূর ব্যবধান বরাবরই বজায় ছিল। মথুরমোহন গদাধরের জীবনের অলৌকিকত্ব প্রচারে উৎসাহী ছিলেন, কেননা ঐভাবে তিনি মন্দিরের বিগ্রহ ও পুরোহিতপদের মর্যাদা বাড়াতে চেয়েছিলেন। পরে হৃদু অনুরূপ প্রচারকাজে নেমেছিলেন এই কারণে যে, ঐভাবে তিনি সম্ভবত বিত্তশালী ব্যক্তিদের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের মতলবে ছিলেন।[৭] তাই ভাগিনেয়র কাজে একজন সৎ ও সাধু ব্যক্তি হিসেবে গদাধরের যথেষ্ট আপত্তি থাকলেও মথুরবাবু কিন্তু হৃদয়রামের কাজে দোষের কিছু দেখতে পান নি, কারণ হৃদুর প্রচার কার্যত মথুরের কাজেরই পরিপূরক ছিল।

আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে আমরা এখানে ব্রাহ্মসমাজ নেতা শিবনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক বর্ণিত একটি ঘটনার উল্লেখ করব।[৮] একদিন তিনি দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের ঘরে বসে আছেন। এমন সময় কলকাতা থেকে কয়েকজন সুসজ্জিত ধনী ব্যক্তি রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে সেই ঘরে এলেন। তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা চলার মাঝখানে রামকৃষ্ণ কোনো কার্যব্যপদেশে হঠাৎ কয়েক মিনিটের জন্য ঘরের বাইরে গেলেন। এই অবসরে হৃদয়রাম উপস্থিত ধনী ব্যক্তিদের কাছে মামার 'অলৌকিক' ক্রিয়াকাণ্ডের কথা ফলাও করে বলতে শুরু করেন এবং তাঁর উন্মাদকালীন অবস্থাকেও তাঁর এক অপূর্ব ঈশ্বরীয় অবস্থা বলে ব্যাখ্যা করতে থাকেন। ঘরে ফিরে আসতে আসতে হৃদয়ের শেষ কথাগুলি রামকৃষ্ণের কানে গেল। তিনি ঘরে ঢুকে অন্যের কাছে তাঁকে বাড়িয়ে বলার জন্য হৃদয়কে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করলেন। শাস্ত্রীমশাই জানাচ্ছেন, রামকৃষ্ণ যা বললেন তা আজও স্পষ্ট মনে আছে। তিনি হৃদুকে বললেন, 'তোর

মন এত নীচু যে এইসব বড়লোকদের কাছে আমাকে এত বাড়িয়ে বলছিল। এঁদের দামী বেশভূষো, সোনার ঘড়ি আর চেন দেখেছিস তো মামার নাম ভাঙিয়ে ওঁদের কাছ থেকে যত পারিস টাকা আদায়ের ফন্দি এঁটেছিস। এঁরা যদি এমনিতে আমাকে বড় না ভাবেন তো আমার কচু এসে যায়।' তারপর ধনী ব্যক্তিদের দিকে মুখ ফিরিয়ে রামকৃষ্ণ বললেন, 'না, বাবুমশাইরা, হৃদু আমার সম্পর্কে আপনাদের কাছে যা বলেছে তা মোটেই সত্যি নয়। শুধু ঈস্বরভক্তি বাইরের জগৎ থেকে আমাকে আলাদা করে ফেলে নি। বিভিন্ন সময়ে মন্দিরে সমাগত সাধুরা অনেক কিছু সাধন-ভজন করতে আমাকে উপদেশ দিতেন। আমি তাঁদের কথামতন চলে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনা করে উন্মাদরোগে আক্রান্ত হই।' আমরা যে রামকৃষ্ণের 'অলৌকিক' কাজকর্মের এক মস্ত প্রচারক হিসেবে হৃদয়রামকে ধরেছি তার সমর্থন মেলে স্বয়ং রামকৃষ্ণের কথায়।

রামকৃষ্ণ-জীবনের 'অলৌকিকতা' সম্পর্কে মথুর বিশ্বাসের মতন হৃদয়রামেরও কিছু 'দিব্য দর্শন' ঘটেছিল। এখন তার নমুনা স্বরূপ দু-একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে আমরা হৃদয়রাম প্রসঙ্গের ইতি টানব।

ক. একদিন রাত্রে মামাকে পঞ্চবটী অভিমুখে একাকী যেতে দেখে হৃদয় তাড়াতাড়ি গাড়ু আর গামছা নিয়ে তাঁর পিছু পিছু অনুসরণ করতে লাগলেন। কিছুদূর যেতেই হৃদু দেখতে পেলেন, রামকৃষ্ণ 'রক্তমাংসের দেহধারী নন, তিনি এক জ্যোতির্ময় পুরুষ।' তাঁর দেহনিঃসৃত অপূর্ব জ্যোতিতে গোটা পঞ্চবটী উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে আর তাঁর জ্যোতির্ময় পদযুগল মাটি না ছঁয়েই শূন্যে তাঁকে বয়ে চলেছে ইত্যাদি।[৯]

খ. হৃদয়রামের 'অপূর্ব দর্শনে'র অপর একটি ঘটনা এখানে বিবৃত হলো। সে-বছর দেশের বাড়িতে তিনি দুর্গাপুজোর আয়োজন করেছেন এবং সেই উপলক্ষ্যে মামাকেও সেখানে নিয়ে যেতে চান। মথুরবাবু কিন্তু হৃদয়রামের এই সযত্ন-পোষিত ইচ্ছায় বাদ সাধলেন। কারণ রামকৃষ্ণ মথুরের বাড়ির পুজো ফেলে অন্য কোথাও পুজো করান তা মথুরের আদৌ মনঃপূত ছিল না। তখন রামকৃষ্ণ তাঁকে এই বলে সান্ত্বনা দিলেন যে, তিনি পুজোর কয়েকটা দিন 'প্রত্যহ আরতির সময় সূক্ষ্ম দেহে' তাঁর পুজোমণ্ডপে হাজির থাকবেন। হৃদয়ও প্রতিদিন আটটার সময় রামকৃষ্ণকে জ্যোতির্ময় দেহে প্রতিমার পাশে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখতে পেতেন।[১০]

গ. গদাধরের জন্ম নিয়েও নানা অলৌকিক কাহিনী জনসমাজে প্রচলিত আছে। এই পারিবারিক ঘটনাগুলিই প্রধানত হৃদয়রামের রটনা বলেই অনুমান করা যেতে পারে, কারণ গদাধরের পরিবারের মধ্যে একমাত্র তিনিই মামার জীবনের অলৌকিকত্ব প্রচারে সবচেয়ে বেশি উৎসাহী ছিলেন।[১১]

৩. বৈষ্ণব ভৈরবী যোগেশ্বরী-র ভূমিকা : এযাবৎকাল গদাধরকে নিয়ে বিবিধ অলৌকিক গালগল্পের অবতারণা হলেও তাতে দেবত্ব আরোপের কোনো সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াস এখনো অবধি পরিলক্ষিত হয় নি। প্রাথমিক পর্যায়ে অবশ্য আমরা দেখেছি, মথুরবাবুর পক্ষ থেকে তাঁকে শিব ও শক্তির প্রতিভূরূপে দেখার একটা ক্ষীণ প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। কিন্তু সে প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতা সেদিন রক্ষিত হয় নি। রামকৃষ্ণকে তখন মানবদেহধারী দেবতারূপে না দেখে তাঁকে কিছু অলৌকিক গুণসম্পন্ন মানুষ বলেই গণ্য করা হতো। গদাধরের দেবত্ব আরোপের একটি সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াস শুরু হয় দক্ষিণেশ্বরে বৈষ্ণবী ভৈরবী যোগেশ্বরীর আগমনের সঙ্গে।[১২] তিনি 'প্রমাণ' করতে উঠে পড়ে লাগেন যে, গদাধর শুধু অলৌকিক গুণসম্পন্ন মানুষ নন, তিনি মনুষ্যদেহধারী স্বয়ং ঈশ্বর অর্থাৎ অবতার।

সত্যি কথা বলতে গেলে, আজ অবতারত্ব মোটামুটি সমগ্র হিন্দু সমাজ কর্তৃক গৃহীত হলেও মূলত এটি হলো একটি বৈষ্ণবীয় মতবাদ। বৈষ্ণবরা হলেন বিষ্ণু-উপাসক। হিন্দু মতে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের ভার অর্পিত রয়েছে তিন দেবতার উপর—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। ব্রহ্মার সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ড বিষ্ণুই রক্ষা করেন। বিষ্ণু কিন্তু কেবল কার্যকারণশাসিত প্রকৃতিকেই রক্ষা করেন না, ব্রহ্মাণ্ডের নৈতিক শৃঙ্খলাও তিনি রক্ষা করেন। কাজেই বিশ্বে যখনই ধর্মগ্লানি উপস্থিত হয়, তখন বিষ্ণু পুনরায় ধর্ম সংস্থাপন করার উদ্দেশ্যে তিনি মনুষ্যদেহ ধারণ করে পৃথিবীর বুকে 'অবতরণ' করেন। তখন তাঁকে বলা হয় 'অবতার'। বিষ্ণু-সাধিকা যোগেশ্বরী রামকৃষ্ণকে এমনই এক 'অবতার' বলে 'প্রমাণ' করতে সচেষ্ট হলেন। ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল থেকে অবতারের সংখ্যা নির্দিষ্ট এবং সাধারণভাবে অবতারের সংখ্যা এদেশে দশ বলেই স্বীকৃত। এঁদেরকে চিহ্নিত করাও হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনে বারবার যাঁর আসার সম্ভাবনা তত্ত্ব হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে, তাঁকে আগে থেকেই নির্দিষ্ট সংখ্যায় বেঁধে ফেলার কোনো অর্থ হয় না। কাজেই ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক ইংরেজি শিক্ষা প্রচলিত হবার ফলে দেশের মধ্যে যখন ব্যাপকভাবে নাস্তিক্য বুদ্ধির প্রসার হচ্ছে তখন এক নতুন অবতারের সম্ভাবনার কথা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সুতরাং বৈষ্ণবী যে এক নতুন অবতারের

আবির্ভাবের কথা ঘোষণা করেছেন তা আদৌ অবতারতত্ত্ব-বিরোধী নয়। তিনি অবশ্য গদাধরকে এই নতুন অবতার বলে চিহ্নিত করেছেন, তার 'যোগজ-দৃষ্টি'র সাহায্যে গদাধরের শাস্ত্রোক্ত কতকগুলি দৈহিক লক্ষণ দেখে।

অজ্ঞাতকুলশীল এক রমণীর কথায় কে বিশ্বাস স্থাপন করবে? তাই বৈষ্ণবী ভৈরবীর কথা যাচাই করে দেখার জন্য তাঁর পরামর্শ মতন মথুরবাবু এক বিচারসভা ডাকলেন। কলকাতার পণ্ডিতমহলে তখন বৈষ্ণবচরণের খুব নাম-ডাক। তাঁর ঈশ্বরভক্তি ও দর্শনাদি শাস্ত্রে দখল তাঁকে তৎকালীন বৈষ্ণব সমাজের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতার আসনে বসিয়েছিল এবং ধর্ম-বিষয়ক কোনো মীমাংসায় উপনীত হতে হলে বৈষ্ণবরা সাধারণত তাঁকেই আগে আমন্ত্রণ জানাতেন। মথুরবাবর সঙ্গেও তাঁর বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। কাজেই মথুরবাব বৈষ্ণবচরণকে বিচারসভায় ডাকা মনস্থ করলেন।

বীরভূম অঞ্চলের গৌরী পণ্ডিতের খ্যাতিও সেকালে বহুবিস্তৃত ছিল। মথুরমোহন তাঁকেও ঐ সভায় আমন্ত্রণ জানালেন।

বৈষ্ণবচরণ নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সভায় উপস্থিত হলেন। গৌরী পণ্ডিত কিন্তু সেদিন ঐ সভায় হাজির হতে পারেন নি। কাজেই কোনো আনুষ্ঠানিক সভা সেদিন হতে পারে নি, তবে নিজেদের মধ্যে একটা ঘরোয়া আলোচনা হয়েছিল। বৈষ্ণবচরণ তখন 'ঠাকুরে'র সম্বন্ধে বৈষ্ণবীর সকল কথাই অনুমোদন করেন ও তাঁকে ঈশ্বরাবতার বলে বন্দনা জানান।[১৩]

গৌরী পণ্ডিত এর কয়েকদিন পরে দক্ষিণেশ্বরে এসে দেখা দিলেন। তখন মথুরবাবু বৈষ্ণবচরণ ও অপর কয়েকজন সাধক-পণ্ডিতকে আহ্বান করে নাটমন্দিরে এক পূর্ণ সভার আয়োজন করেন। গৌরী পণ্ডিত সভায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন—'রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বৈষ্ণবচরণের যে মত আমারও সেই মত; অতএব এস্থলে তর্ক নিষ্প্রয়োজন'[১৪] ইত্যাদি।

এইভাবে কয়েকজন অতি কুসংস্কারাচ্ছন্ন শাস্ত্রজ্ঞ 'পণ্ডিত'দের এক সভা গদাধরকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'অবতার' বলে ঘোষণা করল এবং পুরোহিতের পদ থেকে তাঁর উত্তরণ ঘটল অবতারের পর্যায়ে। উত্তরকালে তিনি মাত্র অবতার নন, 'অবতারবরিষ্ঠ' অর্থাৎ অবতারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে বন্দিত হন।

উল্লিখিত বিবরণ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, পুরোহিত গদাধরকে 'অবতার' বানানোর পেছনে তিনজনের সক্রিয় ভূমিকা মুখ্য ছিল—মথুরমোহন, হৃদয়রাম ও ভৈরবী। প্রচারদক্ষ ভৈরবী তাঁর 'যোগদৃষ্টি' বলে গদাধরের মধ্যে মহাভাব ও অবতারত্বের সমুদয় দৈহিক লক্ষণ 'দেখতে' পেয়েছিলেন। যোগেশ্বরীর ক্ষেত্রেও আমরা দেখি সেই তথাকথিত 'দিব্যদর্শন' যা মথুরমোহন ও হৃদয়রামের বেলায়ও সক্রিয় ছিল। তিন ব্যক্তিই 'দেখেছিলেন' তাঁরা যা করতে চেয়েছিলেন। মথুরের উদ্দেশ্য ছিল সংশ্লিষ্ট মন্দির ও ইষ্টদেবীকে অমর্যাদার হাত থেকে রক্ষা করা, হৃদয়ের উদ্দেশ্য ছিল মামার নাম ভাঙিয়ে দু-পয়সা কামানো আর ভৈরবীর উদ্দেশ্য ছিল একজন উচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন সাধককে শিষ্যরূপে পাওয়া।[১৫] ইতিপূর্বে ভৈরবী চন্দ্র ও গিরিজা নামে যে দু-জন প্রচুর সম্ভাবনাপূর্ণ শিষ্য লাভ করে করেছিলেন, সিদ্ধাই-এর কবলে পড়ে তাঁদের পক্ষে অধ্যাত্ম-জীবনের শীর্ষস্থানে ওঠা আর সম্ভব হয় নি। একজন অবতারকে এখন দীক্ষা দিয়ে তিনি তাঁর এতদিনের অপূর্ণ অভিলাষ পূরণ করলেন।

বৈষ্ণবাচার্যগণের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ক্রমশ বৃহত্তর জনসমাজের রায়ের দ্বারাও সমর্থিত হলো। অধুনা পরমহংসের নাম দক্ষিণেশ্বর গণ্ডগ্রামের ক্ষুদ্র গণ্ডি ছাড়িয়ে মধ্য ও উত্তর কলকাতার কিছু কিছু অংশে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং বিশেষ করে ছুটি-ছাটার দিন সে-সব জায়গা থেকে ভক্তমণ্ডলী এসে রাসমণির মন্দিরে ভিড় জমাতে থাকল। কেউ কেউ রোগমুক্তির আশায়, আবার সংসারতাপ ও পাপবোধ-তাড়িত হয়েও অনেকে রামকৃষ্ণের দ্বারস্থ হলেন।তবে নিছক ভক্তিভাবের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের সংখ্যাও অল্প ছিল না। এই বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে সমাগত দর্শনার্থীদের প্রায় সবারই মন ছিল নানা কুসংস্কার-কবলিত ও ধর্মগুরুদের অতি-প্রাকৃত শক্তিতে অন্ধবিশ্বাসী। এঁরা রামকৃষ্ণের জীবনে রকমারি অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ রটিয়ে তাঁকে জনচিত্তে অবতারের এক স্থায়ী আসনে অধিষ্ঠিত করলেন।[১৬]

তা ছাড়া, এখন থেকে গুরুর আসনে বসে রামকৃষ্ণ যেভাবে ঐশী শক্তিকে ব্যাখ্যা করতে শুরু করেন তার চমৎকারিত্বও তাঁর অবতারত্ব লাভের পথে একটা নতুন পদক্ষেপ বলে গণ্য করা যেতে পারে।

সূত্রনির্দেশ:

১. লীলাপ্রসঙ্গ, দ্বিতীয় খণ্ড (সাধকভাব), পৃ ৭৬ (পাদটীকা)।
২. লীলাপ্রসঙ্গ (পূর্বকথা ও বাল্যজীবন), সপ্তম অধ্যায় (গদাধরের কৈশোরকাল), পৃ ১০১-১১৯।

৩. মথুরবাবু 'ইতোমধ্যে' গদাধরকে দেবীর বেশকারীর কাজে নিযুক্ত করার 'সঙ্কল্প' মনে মনে স্থির করে রামকুমারকে জানালে 'রামকুমার তাহাতে ভ্রাতার মানসিক অবস্থার কথা তাঁহাকে আনুপূর্বিক নিবেদন করিয়া তাঁহাকে ঐ বিষয়ে নিরুৎসাহিত করেন। কিন্তু মথুর সহজে নিরস্ত হইবার পাত্র ছিলেন না।'—লীলাপ্রসঙ্গ, ২য় খণ্ড (সাধকভাব), পঞ্চম অধ্যায়, পৃ ৮৭।

৪. পিতৃস্থানীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমারের নিষেধ অগ্রাহ্য করে গদাধরকে মন্দিরের কাজে নিয়োগ ও সেই কাজে তাঁকে সাহায্য করার জন্য তাঁর সহকারীরূপে হৃদয়রামের নিয়োগ—এই সব ঘটনা থেকে মন্দিরের কাজের সঙ্গে গদাধরকে যুক্ত করার জন্য মথুরমোহনের আগ্রহাতিশয্য-ই প্রকাশ পায়। আমরা আগেই দেখেছি, প্রথমাবধি মথুরবাবু তাঁদের কালীমন্দিরে একজন ঐশী শক্তিসম্পন্ন পুরোহিত নিযুক্ত করতে আগ্রহী ছিলেন। তাঁর বিচক্ষণ দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল, মূর্ছারোগাক্রান্ত গদাধরকে সেই আকাঙ্ক্ষি পুরোহিত বলে চালিয়ে দেওয়া যেতে পারে, কারণ আমাদের দেশে সুপ্রাচীনকাল থেকে মন্দিরের মূর্ছারোগগ্রস্ত পূজকদের উপর দেবতার 'ভর' হয়েছে বলে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়ে আসছে। বস্তুত 'ভর' ও অবতারের মধ্যে যে পার্থক্য তা যতখানি পরিমাণগত ততখানি গুণগত ছিল। মনুষ্যদেহে সাময়িকভাবে দেবতার অবতরণ ঘটলে হয় 'ভর' আর মনুষ্যদেহে স্থায়ীভাবে দেবতার অবতরণ ঘটলে হয় 'অবতার'। লীলাপ্রসঙ্গ, ২য় খণ্ড (সাধকভাব), অষ্টম অধ্যায়, পৃ ১২২-১২৯।

৫. প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ ১৯২-১৯৪।

৬. অমরেন্দ্র ঘোষ, যুগাবতার রামকৃষ্ণ, পৃ ৪৮।

৭. লীলাপ্রসঙ্গ, দ্বিতীয় খণ্ড (সাধকভাব),৫ম অধ্যায়, পৃ ৮৮-৯০।

৮. Sivnath Sastri, Men I have Seen, Chapter- 'Personal Reminiscences of Ramkrishna Paramahamsa, pp. 103-105.

৯. লীলাপ্রসঙ্গ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৩৩৪।

১০. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩৮-৩৩৯।

১১. প্রাগুক্ত, প্রথম খণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়, চন্দ্রাদেবীর বিচিত্র অনুভব, পৃ ৬০-৬৯।

১২. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, ১০ম অধ্যায়, ভৈরবী ব্রাহ্মণী সমাগম, পৃ১৮৭-১৯৬; প্রাগুক্ত, গুরুভাবের উত্তরার্ধ, ১ম অধ্যায়, বৈষ্ণবচরণ ও গৌরীর কথা, পৃ ৪-৪১।

১৩. লীলাপ্রসঙ্গ, ৪র্থ খণ্ড (গুরুভাব উত্তরার্ধ), পৃ ২১।

১৪. লীলাপ্রসঙ্গ, ৪র্থ খণ্ড (গুরুভাব—উত্তরার্ধ), পৃ ৪১।

১৫. লীলাপ্রসঙ্গ, ৩য় খণ্ড (গুরুভাব—পূর্বার্ধ), ৮ম অধ্যায়, পৃ ২৫৩ ('বামণীর যোগলব্ধ দর্শন')। ভৈরবী ছিলেন একজন অতি বিদুষী ও উঁচু দরের বৈষ্ণব সাধিকা। তাঁর শিষ্য সংখ্যা নিতান্ত সীমিত (মাত্র তিনজন) হলেও তাঁরা সকলেই ছিলেন অধ্যাত্ম-জগতের শীর্ষস্থানীয়। রামকৃষ্ণ ছিলেন তাঁর ৩য় ও শেষ শিষ্য। প্রথম দুই শিষ্য (চন্দ্র ও গিরিজা) সাধন পথে অনেকদূর অগ্রসর হলেও সাময়িকভাবে তাঁদের অধঃপতন ঘযেছিল। ভৈরবীর সমগ্র দৃষ্টি তখন রামকৃষ্ণের উপরই নিবদ্ধ ছিল।

১৬. প্রাগুক্ত, গুরুভাব---উত্তরার্ধ, চতুর্থ ধ্যায়ে রামকৃষ্ণ-সম্পর্কিত এই সব অলৌকিক, অতিপ্রাকৃত ঘটনার কতকগুলির বিবরণ পাই।

*জুলাই, ১৯৯১*

উমা

**সম্প্রতি দিল্লি উচ্চ আদালতের মহামান্য বিচারপতি ধর্মেশ শর্মা সরকারকে এই বলে সতর্ক করে দিয়েছেন, 'আমাদের দেশ জুড়ে হাজার হাজার সাধু, বাবা, ফকির, গুরু রয়েছেন তাঁদের সবাইকে পথেঘাটে যেখানে সেখানে মন্দির, সমাধি নির্মাণ করতে দেওয়া হলে মানুষের দুর্গতির শেষ থাকবে না।' (Indian Express, June 2, 2024)**

**সম্প্রতি ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা এবং মান বিষয়ক কর্তৃপক্ষ (এফএসএসএআই)) জানিয়েছেন, গোটা দেশে তাঁরা ২০২১, ২০২২ এবং ২০২৩ সাল জুড়ে যে ৪,২৯,৬৮৫টি খাবারের নমুনা পরীক্ষা করেছিলেন, তাদের মধ্যে ১,০৫,৯০৭টি নমুনাই নিরাপত্তাসূচক মাপকাঠি উত্তীর্ণ হতে পারে নি। অর্থাৎ প্রায় ২৫ শতাংশের কাছাকাছি।**

# রবীন্দ্রনাথের ব্রাহ্মণবিদায়

## আশীষ লাহিড়ী

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন রবীন্দ্রনাথের *ন্যাশনালিজম* বইটি ম্যাকমিলান থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৭ সালে। জাপানে ও আমেরিকাতে প্রদত্ত তিনটি বক্তৃতার সমাহার বইটি। শাসকশ্রেণি-প্রণোদিত মূলস্রোতের বিরুদ্ধে গিয়ে, সাম্রাজ্যবাদী জাতীয়তাবাদ ও জাতীয়তাবাদের নামে যা-কিছু চলে, তার ভয়াবহতাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন তিনি। মনে রাখতে হবে, তখনো হিটলার তার নখদন্ত নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেনি। তার অনেক আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথ উগ্র জাতীয়তাবাদ, যা ফ্যাসিবাদের জনক, তার সক্রিয় বিরোধিতা করেছিলেন, এ ঘটনাটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ বই প্রকাশ করে তিনি বহু ভারতীয় হিন্দুপন্থী জাতীয়তাবাদীকে অখুশি করেছিলেন, জাপানি ও মার্কিন জাতীয়তাবাদীদের তো কথাই নেই। জাপানি বুদ্ধিজীবীদের একটা বড়ো অংশ তো তাঁর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে শুরু করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, আপনি তো এক পরাজিত পরাধীন দেশের মানুষ, আপনি কী বুঝবেন স্বাধীন দেশের আগ্রাসী জাতীয়তাবাদের মাদকতার মহিমা। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজিতে লিখেছিলেন কবিতা, তার নাম Song of the Defeated.

এ যেমন একটা দিক, তেমনি ওই বই-ই তাঁকে রমাঁ রোলাঁর মতো উদারমনা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মনীষীর কাছে প্রিয় করে তোলে। অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল বইটি। ইংরেজিতে এর একের পর এক পুনর্মুদ্রণ হয়, শুধু ১৯১৮ সালেই দুবার। প্রায় প্রত্যেকটি ইউরোপীয় ভাষায় এর অনুবাদ হয়, সম্ভবত জাপানি, চীনা ও রুশ ভাষাতেও। জার্মান ও ফরাসি ভাষায় এ নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছিল। শোনা যায়, স্বয়ং লেনিন নাকি দাগ দিয়ে দিয়ে পড়েছিলেন এ বই। আশ্চর্যের ব্যাপার, এমন একটি আন্তর্জাতিকভাবে বিতর্কিত ও সমাদৃত বইয়ের প্রথম বাংলা অনুবাদ বেরোয় প্রথম প্রকাশের পঁচানব্বই বছর পরে, ২০১২ সালের জুলাই মাসে! অনুবাদ করেন অশোককুমার মুখোপাধ্যায় ও কৃত্যপ্রিয় ঘোষ (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ)। বাংলা ভাষায় রবীন্দ্র-চর্চার দীনতার, রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববীক্ষা অনুধাবনে বাঙালি ভদ্রলোকদের অনীহার এক অভ্রান্ত প্রমাণ এই ঘটনা।

ম্যাকমিলান প্রকাশিত ইংরেজি সংস্করণটিতে বইয়ের শেষে 'দ্য সানসেট অব দ্য সেঞ্চুরি' নামে পাঁচ স্তবকে বিভক্ত একটি কবিতা যোগ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তার শিরোনামের নীচে বন্ধনীর মধ্যে লেখা ছিল : 'রিট্ন ইন দ্য বেঙ্গলি অন দ্য লাস্ট ডে অব দ্য লাস্ট সেঞ্চুরি'। অর্থাৎ মূল বাংলা কবিতাটি ঊনিশ শতকের শেষ দিনে রচিত, ১৮৯৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর। রাজ্য পুস্তক পর্ষদের অনুবাদে অবশ্য কবিতাটি ঠাঁই পায়নি। অনুসন্ধানে জানা গেল, যে-বিশেষ সংস্করণ থেকে বাংলা অনুবাদটি করা হয়েছিল সেটির সম্পাদক রামচন্দ্র গুহ মশাই কবিতাটিকে অপ্রয়োজনীয় বিবেচনায় বাদ দিয়েছিলেন।

এই কবিতা রচনার ইতিহাস সম্বন্ধে প্রশান্তকুমার পাল জানাচ্ছেন, 'নিশ্চিত করে বলা যায় না, হয়তো শিলাইদহে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ সূর্যাস্ত দেখে তিনি নৈবেদ্য-র ৬৪-সংখ্যক 'শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ মাঝে অস্ত গেল' কবিতাটি রচনা করেন। এটি রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতাগুলির মাঝে একটি।

শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ মাঝে
অস্ত গেল,—হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী
ভয়ংকরী। দয়াহীন সভ্যতা-নাগিনী
তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমিষে,
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি' তীব্র বিষে
স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত,—লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম;—প্রলয়-মন্থন-ক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি
পঙ্কশয্যা হতে। লজ্জা শরম তেয়াগি
জাতিপ্রেম নাম ধরি', প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।
কবিদল চিৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি।
শ্মশান-কুক্কুরদের কাড়াকাড়ি-গীতি।

প্রশান্তবাবু এর পটভূমি ব্যাখ্যা করে বলেছেন: 'রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। আফ্রিকার মূল্যবান খনিজ-সমৃদ্ধ দক্ষিণাঞ্চল ও চীনের ঐশ্বর্যের বাঁটোয়ারা নিয়ে য়ুরোপীয় জাতি দ্বন্দ্বের স্বরূপ তাঁর কাছে গোপন ছিল না। তাই বুয়র-যুদ্ধে ইংরেজের সহায়তার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার

ব্যারিস্টার মোহনদাস গান্ধী যখন সহস্রাধিক স্বেচ্ছাসেবকের ইন্ডিয়ান অ্যাম্বুলেন্স কোর গঠন করে রাজভক্তির পুরস্কার-স্বরূপ কাইজার-ই-হিন্দ পদক লাভ করছেন, কলকাতার গণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ টাউন হলে সভা ডেকে ব্রিটিশের যুদ্ধ-তহবিলে হাজার হাজার টাকা দান করছেন, —রবীন্দ্রনাথ তখন তাকে ধিক্কার' দিয়েছিলেন।

এই বিখ্যাত কবিতাটির সঙ্গে তার ইংরেজি অনুবাদটিকে মেলাতে গিয়ে দেখতে পাই, রচনার ষোলো বছর পর অনুবাদ করতে বসে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ঢঙে বাংলা কবিতাটিকে ঢেলে সাজিয়ে নিয়েছেন। তার সঙ্গে যোগ করেছেন একই ভাবে অন্য কিছু কবিতার বিশেষ বিশেষ অংশের অনুবাদ। মাঝখানের এই পনেরো-ষোলো বছরে তাঁর চেতনায় যুগান্তর ঘটে গেছে। বিশ্ব জুড়ে উগ্র জাতীয়তাবাদের নাম করে সাম্রাজ্যবাদ কীভাবে তার শোষণ ও শাসনের থাবা বসিয়ে চলছে, সে বিষয়ে তাঁর ধ্যানধারণা এখন আরো স্বচ্ছ। তাঁর আন্তরিক কামনা, ভারত যেন উপনিবেশ-বিরোধিতার নামে ওই উগ্র জাতীয়তাবাদের কবলে না পড়ে। ইংরেজি অনুবাদের পরিবর্তনগুলির মধ্যে তাঁর সেই শাণিত সাম্রাজ্যবাদ-তথা-জাতীয়তাবাদ বিরোধিতার স্পষ্ট চিহ্ন ফুটে ওঠে। এখানে পুরো কবিতাটা আলোচনার সুযোগ নেই। কেবল একটি ছোট্টো, কিন্তু অসীম গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করব।

*নৈবেদ্য* কাব্যগ্রন্থের ৬৬ নম্বর কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে ছিল: 'এই শ্মশানের মাঝে ... পূর্বসিন্ধুপারে/বহু ধৈর্যে নম্র স্তব্ধ দুঃখের তিমিরে/সর্বরিক্ত অশ্রুসিক্ত দৈন্যের দীক্ষায়/দীর্ঘকাল—ব্রাহ্মমুহূর্তের প্রতীক্ষারত 'আনন্দ-আলোক'-এর কথা। শব্দ-ভারাক্রান্ত এ অংশটি লেজার-সদৃশ তীব্র-সংহত আকার নেয় ইংরেজিতে। 'নৈবেদ্য'র ৬৭ নম্বর কবিতার শুরুতেও আছে সেই প্রভাতের কথা: সে পরম পরিপূর্ণ প্রভাতের লাগি, হে ভারত, সর্বদুঃখে রহ তুমি জাগি/সরলনির্মলচিত্ত —সকল বন্ধনে/আত্মারে স্বাধীন রাখি, পুষ্প ও চন্দনে/আপনার অন্তরের মাহাত্ম্যমন্দির/সজ্জিত সুগন্ধি করি, দুঃখনম্রশির/তাঁর পদতলে নিত্য রাখিয়া নীরবে। এই অংশটিও সংহত ও দৃঢ়বদ্ধ হয়ে, আধ্যাত্মিকতার আরোপিত উচ্ছ্বাস কমিয়ে, ইংরেজিতে অনেক ঋজু রূপ নিয়েছে: Keep watch, India./Bring your offerings of worship for that sunrise. মূল কবিতায় এর পরের উপদেশ-বাণীসুলভ স্তবকটিকে শল্যচিকিৎসকের নিঠুর-দরদি হাতে কেটে বাদ দিয়েছেন কবি। সোজা চলে গেছেন *নৈবেদ্য*র ৬৮ নম্বর কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে : এসো শান্তি, বিধাতার কন্যা ললাটিকা, /নিশাচর পিশাচের রক্তদীপশিখা/করিয়া লজ্জিত। তব বিশাল সন্তোষ/বিশ্বলোক-ঈশ্বরের রত্নরাজকোষ।/তব ধৈর্য দৈববীর্য। নম্রতা তোমার। সমুচ্চ মুকুটশ্রেষ্ঠ, তাঁরি পুরস্কার।

তবে সত্যিকারের অবাক-করা, অত্যন্ত তাৎপর্যময় পরিবর্তনটিও এই স্তবকেই রয়েছে। মূল বাংলায় ছিল : 'তুমি থেকো সাজি,/চন্দনচর্চিত স্নাত নির্মল *ব্রাহ্মণ*—/উচ্চশির ঊর্ধ্বে তুলি গাহিয়ো বন্দন।' এইখানে ইংরেজিতে 'ব্রাহ্মণ' উধাও; তার জায়গায় সরাসরি এসেছে ভারত Keep watch, India./ Bring your offerings of worship for that sunrise. শুধু ব্রাহ্মণরা নয়, গোটা ভারতের কাছে এখন তাঁর নিবেদন হুঁশিয়ার, ভারত! এ-কে চিন্তাক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন বললে অত্যুক্তি হবে না।

এই পরিবর্তনের মনস্তত্ত্ব নিয়ে দুকথা বলা যেতে পারে। *নৈবেদ্য* রচনাকালে, এমনকি তার কিছুদিন পর অবধি, রবীন্দ্রনাথের মনে ছায়া বিস্তার করেছিল ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক রক্ষণশীলতার মেঘ। বাস্তবিক, 'বঙ্গদর্শন' নব পর্যায়ের যে সংখ্যায় (১৫ মে, ১৯০১) 'শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘমাঝে/অস্ত গেল' কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল, সেই সংখ্যাতেই বেরিয়েছিল তাঁর 'হে সকল ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর'। এই কবিতাটিকে কেন্দ্র করে ওই সংখ্যাতেই ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় 'হিন্দুজাতির একনিষ্ঠতা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, যাতে বর্ণাশ্রম ধর্মের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়: 'যতদিন ঋষিদিগের অভেদদৃষ্টি এবং বর্ণধর্ম্ম পুনরাবির্ভূত না হয় ততদিন ভারতের উত্থান অসম্ভব।' প্রশান্তকুমার পাল মন্তব্য করেছেন, '...ব্রহ্মবান্ধবের ব্যক্তিগত প্রভাবে সাময়িকভাবে অভিভূত রবীন্দ্রনাথ বেশ কিছুকাল হিন্দুত্বের এই প্রতিক্রিয়াশীল জগতে অবস্থান করেছেন।' অথচ সেই কবিতাকে আশ্রয় করেই তিনি ষোলো বছর পর ঘোষণা করলেন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র বিরোধী বিদ্রোহ। ব্রাহ্মণ নামক একটি বিশেষ বর্ণ এখন তাঁর কাছে গুরুত্বহীন; তাঁর আবেদন এখন সারা ভারতের সব মানুষের কাছে, জাতিবর্ণধর্ম নির্বিশেষে।

কোনো কোনো হিন্দুত্ববাদী আজকে রবীন্দ্রনাথের ওই সাময়িক বিচ্যুতিকে পাথেয় করে মাঠে নেমেছেন। তাঁরা চেপে যান যে, কয়েক বছরের মধ্যে সে-ছায়া সরে গিয়েছিল, কবি ফিরে এসেছিলেন তাঁর নিজস্ব মানুষের ধর্মে। সেই প্রত্যাবর্তনেরই স্পষ্ট নিদর্শন বহন করছে ইংরেজি অনুবাদের এই ব্রাহ্মণবিদায়। এ-ধর্ম থেকে আর কোনোদিন তাঁর বিচ্যুতি ঘটেনি। উমা

# রামরাজ্য

## দীপাবলি দেবরায়

অযোধ্যাতে সদ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে রামমন্দির, তথাকথিত জন্মভূমির ওপরে দাঁড়িয়ে 'রামলাল্লা' হাসছেন যেন ঠিক আপনার দিকেই তাকিয়ে। দীপোৎসব বলে নতুন একটি অনুষ্ঠান শুরু হল। এবার কি আসবে সেই 'রামরাজ্য' যাকে ১৯২৯-এ হিন্দ স্বরাজে (Hind Swaraj) গান্ধীজি বলেছিলেন, "...Divine Raj, the kingdom of God, যা Wikipedia-তেও স্থান করে নিয়েছে (hhtp//:lordrama.co.in/ramarajya.html), এবং মাননীয় উপরাষ্ট্রপতি ধনখড় সম্প্রতি যার সঙ্গে সংবিধানের একটা যোগসূত্র টেনেছেন।

রামরাজ্য কথাটি আমরা অনেকেই ব্যবহার হতে শুনেছি, হয়তো বা নিজেরাও করেছি। সম্প্রতি কথাটি আবার শোনা যাচ্ছে। কিন্তু শব্দটির মানে ঠিক কি? বাল্মীকি রামায়ণ খুঁজলে কথা কিন্তু আদৌ পাবেন না। ওটা গান্ধীজিই চালু করেন। বাল্মীকি ব্যবহার করেছিলেন 'রামস্য বিষয়' বলে দুটি শব্দ (উত্তর কাণ্ড ৭৩ সর্গ)। তা রামের ওই বিষয়টিরই বা আদি কবি কেমন বর্ণনা করেছেন? সে বর্ণনায় কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পাই। যেমন সেখানে নিয়মিত ও পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃষ্টি হত। প্রচুর শস্য উৎপাদন হত। নগর ও জনপদ মানুষ জনে ভরা ছিল। সেসব প্রজাদের যথেষ্ট ভাল স্বাস্থ্য ছিল, অকালমৃত্যুও হত না। রাম খুব যাগযজ্ঞ করতেন, দান দক্ষিণা প্রচুর পাওয়া যেত। আকাশবাতাস পরিষ্কার ছিল। অঘটন ঘটত না। এছাড়া, সেখানে সবার বিচারলাভের আবেদন রামের কাছে ঠিক পৌঁছে যেত। আজকের ভাষায়, অপুষ্টি, শিশু মৃত্যু, বায়ুদূষণ, খরা, জলাভাব, দুর্ঘটনা ছিল না, এমনকি মানুষের প্রয়োজন মেটাতে খরচাপাতিও করা হত। একবারই ছন্দপতন ঘটেছিল। একদিন এক বরাহমন তার মৃত কিশোর পুত্রটিকে অযোধ্যার দুয়ারে নিয়ে উপস্থিত, কারণ ধারণা এই যে অকালমৃত্যু দেশের রাজারই দোষে হয়। রাম লক্ষণকে মৃতদেহটি তেলে চুবিয়ে রাখতে বলে ছুটলেন রাজ্যের সেই প্রান্তে যেখানে ঘটছে এই 'দুষ্কৃত' বা পরম্পরা উল্লঙ্ঘন। শূদ্র শম্বুককে বধ করতে তিনি ধনুকে তীর যোজনা করার অপেক্ষা করেন নি, খড়্গাঘাতেই কাজ সেরেছেন। ওদিকে ব্রাহ্মণ কিশোরটি বেঁচে উঠেছে। রামের রাজ্যপাট বজায় থেকেছে। অর্থনীতিবিদ জয়শঙ্কর কৃষ্ণমূর্তি দেখিয়েছেন ভারতের পেশাগত কাঠামো (occupational structure) বহুকাল থেকে অনড় (stagnant)। তারই নিদর্শন। রামের রাজ্যটি একান্তই পিতৃপুরুষের দান ছিল, ভাই ভরত-ই অরাজকতার দিকটা দেখভাল করেছিলেন। রাম বানর সভ্যতা ও রাক্ষস সভ্যতা দেখে আসা সত্ত্বেও অযোধ্যায় কোনো পরিবর্তন বা উন্নয়ন প্রকল্প আনতে চেষ্টা করেন নি। যেমন, নলকে দিয়ে সরযূর ওপরে কোন সেতু? ইওরোপের মতো এদের নিয়ে দাসপ্রথা শুরু করে দেন নি অবশ্য, কিন্তু এদের সঙ্গে পারস্পরিক কোনো সম্পর্কও গড়ে তোলার চেষ্টা করেন নি। স্থিতাবস্থা বজায় রাখা (maintenance of the status quo) ছাড়া তাহলে তিনি করেছেনটা কী? বৃষ্টি পড়েছে, ভাল ফসল হয়েছে, এতে রামের কৃতিত্ব কোথায়?

যদি বিচার ব্যবস্থার কথা ওঠে, সুবিচার ব্যাপারটার কথা যদি ছেড়েই দিই, অন্তত সেই কাঠামোটাই বা কোথায় ছিল? প্রচুর মন্ত্রী ও তিন ভাই থাকা সত্ত্বেও, রাম সিদ্ধান্ত নিতেন একা এবং সঙ্গে সঙ্গে। সে শম্বুক হোক আর সীতা হোক। এমনকি, সীতার ব্যাপারে তিনি স্পষ্ট লক্ষণকে বলেছিলেন, কোনো 'অতি বক্তব্য' শুনতে চান না। এটা আরো প্রকট হয় তখন কাল হঠাৎ এসে দেখা করলে, এককথায় রামের রাজ্য ছেড়ে সরযূর জলে নেমে যাওয়া ঠিক করে ফেলেন। এত বড় একটা সিদ্ধান্ত, অযোধ্যাবাসীদের একবার জিগ্যেস অবধি করা হল না। তার থেকেও আশ্চর্য, এত যত্ন করে যা এত কাল ধরে রাখা, তার সার্থকতা কি হল? তারপর তখন আপামর জনসাধারণ সঙ্গে যেতে চাইল, এমনকি বানর ও রাক্ষসেরাও, তখনও রাম নির্বিকার। একনায়কত্ব (Dictatorship) এই রকম ভয়ঙ্কর রূপে আর কোথায় আছে! উমা

**ডাঃ গৌতম মিস্ত্রীর প্রবন্ধ সংকলন 'স্বাস্থ্যের সাতকাহন' নিঃশেষিত। বইটির নতুন সংস্করণ দু-খণ্ডে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম খণ্ডটি শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।**

# পরিবারের ভেতরে নারী — এক অগাধ অনতিক্রম্য সেতুহীনতা

যশোধরা রায়চৌধুরী

দুর্গাপুজোয় সিঁদুর খেলা, এখন প্রায় দোল খেলারই মতো জনপ্রিয়।

পুজোয় সিঁদুর খেলতে ইচ্ছে করলে নিশ্চয়ই খেলবে কেউ, এবং মাঝে মাঝেই অপরকে বুকে টেনে নিতে কুমারী বিধবা এমনকি যৌন কর্মীদেরও ডেকে এনে সিঁদুর খেলা হয়। সিঁদুর খেলাকে প্রগতিশীল আন্দোলন বলে প্রচার করার ফাঁদে পড়ে যাবার ভয় থাকে এই ঘটনায়। এ নিয়েই তরজা প্রতিবছর সমাজমাধ্যমে চরমে ওঠে। এই মতটি আমি অন্তত গ্রহণযোগ্য মনে করি।

'একটি প্রগাঢ় হিন্দু বৈবাহিক আধিপত্যের চিহ্নকে (হ্যাঁ, তাই, সিঁদুরের এই চরিত্রটির বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় নি) উদযাপন করার মধ্যে খুব প্রগতিশীল কিছু নেই। কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়া অন্তত কোনোভাবেই সাম্যময় নয়...কোনোভাবেই সেকুলার ত নয়ই, এমনকি মেয়েদের ও কেবলমাত্র সধবাত্ব আর সিঙ্গলহুড দিয়ে ভাগাভাগি করে দিয়ে ডিভাইড অ্যান্ড রুল করার অসভ্য এক ঐতিহ্যমাত্র।' (অভিষেক সরকার)

সিঁদুর নিয়ে এই কথোপকথন হালের। কিন্তু সত্তরের দশকে বড় হওয়া আমি দেখেছি সিঁদুর কীভাবে ভেদাভেদ করে। সৃষ্টি করে অদৃশ্য অচ্ছুত শ্রেণী। তাই আমি কোনোদিন সিঁদুর খেলিনি। কোনোদিন সিঁদুর পরিনি। সেটা আমার নিজস্ব ব্যক্তিগত রুচিপছন্দ, যা রাঙিয়ে দিয়েছে আমার শৈশব অভিজ্ঞতা। আমার কদর্য অভিজ্ঞতা। আমার পিতৃহীনতা।

ছোটবেলায় মাকে বিধবা জেনেছি অন্য কিছু বোঝার আগেই। কারণ মা সবার থেকে আলাদা ছিলেন, অন্য মায়েদের চেয়ে কত্তো আলাদা। চিহ্ন। এখানেও চিহ্ন। মা ধবধবে সাদা শাড়ি পরতেন, আজন্মকালের এই দেখা আমার চোখে থেকে গেছে।

পরবর্তীতে বুঝেছি মায়ের কাছে ওই সাদাও ছিল এক ধরনের বর্ম। নিজেকে অন্য পুরুষের থেকে অস্পৃশ্য রাখাও এবং আলাদা রাখার বর্ম। নিজের চারিদিকে স্টিলের বলয় বানাবার জন্য যথেষ্ট ভাল চিহ্ন।

তাছাড়া, মা কোথাও গেলে মাছ খেতেন না। বৈধব্য বৈধব্য এবং আরো বৈধব্যের চিহ্ন দিয়ে উপুড় হস্ত ছিল আমার ছোটবেলাটা। মা বাড়িতে মাছ মাংস খেতেন কিন্তু সমাজ নামক একটি জুজু ছিল আমাদের ছোটবেলায়। হয়ত আরো বেশি মায়েদের অল্প বয়সে। যাকে শতহস্ত দূর থেকে গড় করবেন বলেই মা এই নাটকটা করতেন। এই ছলনাটা।

সত্যি বলছি এতে কিন্তু আমার বিস্তর অসুবিধা হত। কেন না মা বাড়িতে মাছ মাংস সব রান্না করতেন এবং অনেক বাচ্চার মতোই আমি মাছের কাঁটা বাছার ব্যাপারটা পছন্দ করতাম না, মাংস অনেক বেশি আনন্দদায়ক লাগত। কিন্তু, আমার মাছ খেতে ভাল লাগত না, সেটাও আত্মীয়দের চোখে একটা চিহ্ন হয়ে দাঁড়াল। কোন বাচ্চা কেন মাছ খাবে না, সেটা তাঁদের কাছে বেশি বিসদৃশ ছিল, না, অর্থপূর্ণ ছিল এই তথ্যটি, যে এ এক বিধবার কন্যা! ছিঃ, ভাবতেও এখন গা গুলিয়ে ওঠে, আমি নিজ কর্ণে শুনেছি, তখন মাত্র পাঁচ কি ছয়, বিয়ে বাড়িতে মায়ের কোল ঘেঁষে থাকব বলে মায়ের সঙ্গে বসেছি খাবার জায়গায় এবং সেখানে কেবল নিরিমিষ সার্ভ করা হচ্ছে এবং আমাকে টেনে আমিষ অঞ্চলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে এবং সেই সব কাকিমা জ্যেঠিমারা উচ্চস্বরে বলছেন, ওর মা নিজে মাছ খায় না তাই মেয়েদেরও খাওয়ায় না।

আপনাদের কজনের এই অভিজ্ঞতা আছে জানি না, বাঙালি (অবশ্যই হিন্দুর) যে কোনো উৎসব অনুষ্ঠানের খাওয়াদাওয়ার মূল জায়গায় বিধবাদের বসার জায়গা রাখা হত না। আমিষ আর নিরামিষ অঞ্চলের ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপার সেই শরত চাটুজ্জে থেকে আশাপূর্ণা হয়ে এসে ১৯৬৮-৬৯ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আজ পরিস্থিতি কত পাল্টেছে জানা নেই। এবং মেনুতেও ছিল আশ্চর্য বিভেদ। মাছের পদ যদি দুটি কি তিনটি, মাংস দুরকম...নিরিমিষে একটি ঘ্যাঁট ও হয় ছানার ডালনা নয় ধোঁকা...নয়ত ফুলকপি।

সেই আমিষ অবসেশনের পাপেই বোধ হয় আজ বাঙালির জীবন এত নিরিমিষবাদীদের অত্যাচারে আক্রান্ত। রেস্তরাঁ থেকে শপিং মল অজস্র জায়গায় নিরিমিষের ধাক্কায় প্রাণ ওষ্ঠাগত ...জাস্ট জোকিং...

আমি সিঁদুর পরেছিলাম বিয়ের দিন। তারপর একদিনও না। শ্বশুরকুলের মুখ ম্লান করে দেওয়া হাসি দিয়ে, বলেছিলাম

পরব না। কারণ একদিন পরলে তার পরের দিন, তার পরের দিন, না করার আর সুযোগ থাকত না। পরলে কী হয়, না পরে কী আনন্দ পাও এসব প্রশ্ন তুলতেই দিইনি কারুকে। বিবাহ চিহ্ন ধারণের দায় একা মেয়েদের কেন, এ নিয়ে স্পষ্ট বক্তব্য রেখেছিলাম। বিবাহ সভায় সিঁদুর পরাতে গিয়ে শাশুড়ি জায়ের লাফঝাঁপ লক্ষ্য করেই ঠোঁট টিপে বাধা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই অবিশ্যি।

আমি, কারুর সিঁদুর খেলার ছবিতে আজো লাইক দিই না। আমার অ্যালার্জি আছে। বিধবারাও সিঁদুর খেলুন...অমুকেও খেলুন, তমুকেও খেলুন...এসবে বিশ্বাস করি না। এই বস্তুটিকে এত গুরুত্ব দেওয়াটাই আমার কাছে হাস্যকর।

এই ব্যক্তিগতটি কি খুবই ব্যক্তিগত? না বোধ হয়। আশৈশবের শেখা লেখাপড়ার মধ্যেও ত ছিলই এই ধারণা যে বিবাহ চিহ্ন একটাই চিহ্নই মাত্র। আর কিছু নয়। তাকে গুরুত্ব দিই নি শুধু নয়, একপেশে এই চিহ্ন ধারণ আমার কাছে অবান্তর...একটি পুরুষকে দেখে যদি না বোঝা যায় সে বিবাহিত কি অবিবাহিত, এক মহিলাকে দেখে কেন বোঝা যেতে হবে?

হয়ত এই দৃষ্টিটি আমার পরম্পরাগত প্রাপ্তিও...আমার আত্মীয় একজন, অধ্যাপিকা ও স্বাধীনতা সংগ্রামী। তাঁর হাত থেকে পাওয়াও হয়ত বা।

তিনি শান্তিসুধা ঘোষ। প্রথম মহিলা ঈশান স্কলার। গণিত বিষয় নিজে অধিগত করেছিলেন, তাইই, নারীর বিদ্যাচর্চার প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, 'গণিতশাস্ত্র অধিগত করবার মত সূক্ষ্ম প্রতিভা তাদের আদৌ নেই, এই জাতীয় একটা অপবাদ নারীজাতি সম্পর্কে ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি, সেটা আমার কোনোদিনই হজম করতে ইচ্ছে হয় নি। আজ আত্মপ্রত্যয় বশে আই এ পরীক্ষায় অঙ্কে ভালো করায় তার একটা হাতেকলমে পাল্টা প্রতিবাদ করার ইচ্ছে মনে জাগলো।'

এরপর তিনি যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশনের নতুন পাঠ্যতালিকায় জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে ছেলেতে-মেয়েতে বিষয়ভিত্তিক পার্থক্য দেখেন, তাঁর মনে হয়, যে মেয়েদের বেলায় উচ্চশিক্ষা সঙ্কোচের গূঢ় অর্থ কেবল এটাই হতে পারে, যে সমান শিক্ষা আর জ্ঞানলাভের অধিকারী হলে নারীরস্বাধীনতা খর্ব করার উপায় আর সমাজের হাতে থাকবে না।

শান্তিসুধারই একটি প্রবন্ধের বিষয়, 'বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার'। তিনি কেন বিষয়টি বেছে নিলেন? 'কেননা, এ কথা সত্য, যে, আমাদের সমাজে বহু বিবাহিত জীবনে অশান্তির কালো ছায়া স্ত্রীর জীবনকে লক্ষ্যে বা অলক্ষ্যে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে এবং ইহার প্রতিকার প্রয়োজন'। তিনি সওয়াল করেছেন, 'নারীকে যদি বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার আইনতঃ কাগজপত্রে দেওয়াও যায়, তবুও তাহা কার্যত সফল হইবে না—যতদিন পর্যন্ত নারীকে সম্পত্তি ও উপার্জনক্ষমতায় পুরুষের সমান সুযোগ না দেওয়া যায়।'

এই শান্তিসুধাই, তাঁর উপন্যাসের এক চরিত্রের মুখ দিয়ে বলান, বিয়ে করলেই মেয়েদের মস্তিষ্ক চর্চার পক্ষে অলঙ্ঘ্য বাধা পড়ে। পৃথিবীতে যত কিছু বড় কাজ, তার খুব কমই বিবাহিত মহিলাদের করতে দেখা যায়। 'আইনস্টাইন দরজা ভেজিয়ে নিরালা ঘরে নিজের গণিত গবেষণার বিপ্লব তরঙ্গে যখন দিশেহারা হয়ে থাকেন, তাঁর স্ত্রীকে তো তখন লক্ষ্মী বৌটি সেজে গৃহস্থালীর বন্দোবস্তে মন দিতে হয়—স্বামী তাঁর বিজ্ঞানমন্দির থেকে উঠে এসে কী খাবেন। ... আমার খুব বিশ্বাস এর অভাবেই আইনস্টাইন তাঁর প্রথমা গণিতজ্ঞা স্ত্রীকে বরদাস্ত করতে পারলেন না।'

তিনি নিজের প্রবন্ধেও বলেছেন, 'আমাদের সমাজে নারীর শুধু নারীরূপে কোনো স্থান নাই, সে হয় কুমারী, নয় সধবা, নয় বিধবা।'

'শাঁখা-সিঁদুর-ঘোমটা' নামের একটি প্রবন্ধে শান্তিসুধা প্রশ্ন তোলেন, 'স্বীকার করি, এগুলি দেখিতে সুন্দর লাগে...যদি বা তর্কের খাতিরে স্বীকার করিয়া লই, তবে সে সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি কুমারীকালে করিলেই বা দোষ কী? কারণ, কুমারীকালে লাল টিপ পরার রীতি আছে...বিবাহ হওয়ামাত্রই এগুলি এক অভিনব রূপ ধারণ করে, অন্যথা করে না, ইহার কোন অর্থ হয় না। বধূবেশে এগুলিকে আমরা যে অনির্বচনীয় শ্রী বলিয়া মনে করি, ইহা আমাদের মনের সংস্কার। '...শাঁখা, সিঁদুর, অবগুণ্ঠন ইত্যাদি অশেষ প্রকারের নিদর্শন দ্বারা প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে তাহাকে বিবাহিত জীবন স্মরণ করাইয়া দিবার সূক্ষ্ম কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছে। পতির জীবনের অনুসারেই তাহার সমগ্র জীবন—এই ভাবটি নারীর মনের উপরে দুরপনেয়ভাবে বিস্তার করিতেইহা বাস্তবিকই একটি অপরূপ মায়াজাল, স্বীকার না করিয়া সাধ্য নাই। ...নারীমনকে স্বতন্ত্র মনুষ্যত্ব বিস্মরণ করাইয়া পতিসর্বস্ব করিয়া রাখিবার জন্যই প্রধানতঃ শাঁখা-সিঁদুরাদি প্রথার প্রবল প্রভাবের প্রবর্তন করা হইয়াছিল।'

অন্য একটি কারণও তিনি তীক্ষ্ণ ধীশক্তিতে শনাক্ত করেছেন।

'অবিবাহিতকালে যে কোনও পুরুষ তাহার প্রতি লোভ করিতে অধিকারী...বিবাহ হইলেই সে গুড়ে বালি পড়ে, আর তাহার কেশাগ্র স্পর্শ করিবার অধিকার নাই, কারণ সে এখন

অপরের সম্পত্তি।... । কাজেই কে কুমারী এবং কে সধবা, ইহার অতি পরিস্ফুট পরিচয় নারীর সর্বাঙ্গে না থাকিলে পুরুষের পক্ষে অসুবিধায় পড়িবার সম্ভাবনা—অর্থাৎ লোলুপ হইবার অধিকার আছে কিনা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং শাঁখা সিঁদুর প্রভৃতি ট্রেডমার্কের প্রয়োজন একান্তই হইল।'

১৯৩৮-এ লেখা হয়েছিল এই লেখা...ভাবতে স্তম্ভিত লাগে না কি?

২

সম্প্রতি লাপাতা লেডিজ নামে একটি ছায়াছবি অনেকের মন কেড়েছে। অনেকেই লাপাতা লেডিজের ভূয়সী প্রশংসা করছেন। ছবিটি নানা কারণেই প্রশংসনীয় তো বটেই। অচেনা অভিনেতাদের অপূর্ব চরিত্রায়ণ, মিষ্টি চিনির মোড়কে কুটুস কুটুস করে তিক্ত সত্য সত্য শুনিয়ে দেওয়া। কিন্তু সেসব নিয়ে আলোচনা করা এই নিবন্ধের কাজ নয়। এই নিবন্ধে আমি শুধু একটি বিষয় তুলতে চাই। তা হল মেয়েদের সত্ত্বার বিলোপ বনাম আত্মপরিচয় খুঁজে নেবার কথা।

কেউ একবার বলেছিলেন, যে কোনো গল্প উপন্যাসকে এক লাইনে সার সংক্ষেপ বা সাম আপ করতে চেষ্টা করবে। আমি এই মুহূর্তে সেই চেষ্টাই করছি। এই গল্পের বীজ লুকিয়ে আছে আগাগোড়া জুড়েই একটি ঘোমটায়। বিবাহিত মেয়েদের পরিচয়, লাল রঙের একটি ঘুংঘট। একাধিক নববধূর একই ঘোমটায়, যেখানে মুখ সম্পূর্ণ ঢাকা থাকে, একটাই ট্রেনের ডিব্বায় তাদের মধ্যে ভুল করে অদল বদল হয়ে যাবার ভ্রান্তিবিলাস এই কাহিনী। গল্পে বারবার এই ঘোমটার তিমটা ঘুরেফিরে আসছে। কারণ এ গল্পের ভরকেন্দ্র বউবদল (হ্যাঁ বাক্সবদলের হুবহু সমান্তরালে)। ঘোমটায় মুখ ঢাকা মেয়েদের কাহিনী এটি। ঘোমটার ওপর ঘূর্ণিপাকের মতো গল্পটা ঘুরেছে। অর্থাৎ সমস্যার মুখ্য কালপ্রিট ওই লাল নববধূর ঘোমটা।

বউ হারালে বউ খুঁজতে গেলে, বার বার পুলিশের কাছে ছুটছে লোকে, হারানো বউ ফেরত পাবে কীভাবে? ছবি চাইছে পুলিশ। ঘোমটায় মুখ ঢাকা মেয়েদের ছবি দেখে পুলিশ হেসে ফেলছে। আসলে বিবাহ বিরোধিতা, সংসারে মেয়েদের বঞ্চনা এসব বিষয় নিয়ে মজা করে অনেক কথা বলা হয়েছে এই কাহিনীতে। নিজের নাম, নিজের গ্রামের নাম, বংশ পরিচয়, সব মুছে, মেধা মনন বাঁধা রেখে বিয়ে করছে সে। চলে যাচ্ছে সম্পূর্ণ অজানার উদ্দেশে এক অপরিচিত, ভিন গাঁয়ের, ব্রাউন স্যুট পরা স্বামীর হাত ধরে...সেই স্বামীর নাম ঠিকানাও তার মুখস্থ হচ্ছে না। এই আইডেন্টিটি ক্রাইসিস-এর জায়গাটায় পিনের মাথায় দড়াম করে হাতুড়ি মারার মতো মেরেছেন পরিচালক। ঘোমটায় ঢাকা মুখ এখানে চূড়ান্ত ধরা ছোঁয়ার মতো। কোনো অ্যাবস্ট্রাক্ট না। তবু এটা সিম্বলও বটে। দারুণ এক প্রতীক।

আসল কথাটি যে বিষয় নিয়ে, তা হল আমাদের সংস্কৃতিতে মেয়েদের আইডেন্টিটি নেই। থাকতে নেই। তাদের মুখ নেই। মুখ আছে, ঢাকা চাপা। বোরখা ঘোমটা ঘুংঘটে। আর তাই তাদের নিজেদের ইচ্ছা অনিচ্ছা নেই। নিজেদের পছন্দের রান্না করার অধিকার নেই। স্বামী যে পদ পছন্দ করেন না, শ্বশুরবাড়ি যে রান্না অনুমোদন করে না, শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে একটি মেয়ে সেই রান্না করতে ধীরে ধীরে ভুলে যায়। নিজে সেই খাবার খেতে ধীরে ধীরে ভুলে যায়। মেয়েদের মুখ, মেয়েদের পরিচয়, মেয়েদের পছন্দ অপছন্দও ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়ে যায় শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে 'অ্যাডজাস্ট' করতে গিয়ে।

মুখ চাই মুখ। বিগত দশকের পর দশক ধরেই মুখ খুঁজতে বেরিয়েছে মেয়েরা। আসলে শ্রমজীবী বা গ্রামীণ মেয়েদের কথা নয় শুধু। ঐ ঘোমটার আড়াল যে গ্রাম্য কাল্পনিক প্রাচীনতায় ঢাকা, তা প্রতীকী। তার বাইরেও, ভারতের শহরে শহরেও, কোথাও কোনো স্তরেই, সমাজের কোনো অংশেই, মেয়েদের আত্মপরিচয়ের খোঁজ এক দুরূহ ব্যাপার। আইডেন্টিটি বলে আদৌ কোনো কিছু মেয়েদের আজও স্বীকার করে সমাজ? আজো কোনো পুরুষের বাহুলগ্না মেয়েকে ম্যাডাম অমুক (স্বামীর পদবি) বা বৌদি বলে ডাকার নিয়ম। বহুদিন আগে আমার বরের এক বন্ধু বৌদি বলে আমায় সম্বোধন করেছিল, তার স্ত্রী হঠাৎ বলে উঠেছিল, আরে নামটা বল, নাম নেই নাকি?

৩

ঊনমানবের নিয়তি নারীদের নিয়তি। ঈভ আদমের পাঁজর থেকে তৈরি। সুতরাং কম। চলতি ভাষায় মেয়েরা পুরুষের চেয়ে 'কমা'!

নারী কী? নারী হল যা পুরুষ নয়, পুরুষ থেকে ভিন্ন। ভিন্ন কথাটা সংস্কৃত ভাষায় অন্যভাবে 'ইতর'ও বটে। ইতর শব্দের মানেটা সময়ের সাথে পাল্টে গেল। যা ছিল আলাদা বা ডিফারেন্ট, তা সরে গেল। হয়ে গেল মূল্যমানে কম বা এক ধাপ নিচুতে, এই অর্থে প্রযুক্ত। পরের দিকে তাই মনুষ্যেতর প্রাণী মানে মানুষের থেকে কম বুদ্ধিমান প্রাণী ভাবা হল। আর পুরুষেতর মানে নারী অর্থাৎ নারী পুরুষের এক ধাপ নীচে, ভাবা শুরু হল।

তাছাড়াও নারীকে ভাবা হচ্ছে পুরুষের অস্বীকারমূলক আদলে অর্থাৎ যা পুরুষ নয় তাই হল নারী। অন্যথায় বলা

হচেছ নারী পুরুষের অনুরূপ বা অনুপূরক। কিংবা ‘প্রহেলিকাময়’ নারীজগৎকে অবোধ্য আখ্যা দিয়ে পুরুষের রাজ্যপাট থেকে একেবারে বাদ দেওয়া হয়েছে। এই সব কটার শেষ ফল তাই বহিষ্কার।

ফলত কাব্য সংকলনে কবিদের মধ্যে নারীকে গ্রহণ করায় আপত্তি, যে কোনো মান্য আলোচনা সভায় নারীকে ডাকার ক্ষেত্রে কোনো যোগ্য নারীর নাম মনে না পড়া, এগুলো আমাদের সমাজে ঘটতেই থাকে।

‘মানুষ’ আপাতভাবে একটা নিরপেক্ষ নামপদ হলেও প্রকৃতপক্ষে পুরুষধর্মী। মানবিক গুণাবলী পুরুষের গুণেরই সমাহার, নারী যেন তার মূর্তিময়ী স্খলন, যা বারংবার প্রতিফলিত হয় দ্বিমূল চিহ্ন-কাঠামোয়। ফলে সর্ব ক্ষেত্রেই সঠিক এবং প্রধান ভূমিকা পালন করে পুরুষ। (ঋতু সেন চৌধুরী, নারীবাদের নানা পাঠ)

তাই কবি লেখেন আমি মানব, একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে। মানবের জায়গায় মানবী বসানো যায় না। তাছাড়া মানবী একাকী ভ্রমণ করতেই পারে না, কারণ শাস্ত্র বলে; পথি নারী বিবর্জিতা; দীর্ঘ পথ চলার সময়ে মেয়েদের নিয়ে বেরনো মানেই হ্যাপা। আমার ঢাকার ইডেন স্কুলে শিক্ষিতা দিদিমা বলতেন দাদু খুব খুব ঘুরে বেড়িয়েছেন কর্মব্যপদেশে, প্রায়শ দিদিমার যাওয়া হয় নি। রবি ঠাকুরের পুরাতন ভৃত্যের একটা লাইন খুব বলতেন আমার দিদিমা, পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য নহিলে খরচ বাড়ে। এই কথাটিকে আপন করে নেওয়ার কারণ ছিল ওই; মেয়েদের ট্যাঁকে নিয়ে ঘোরাঘুরি খুব ঝামেলার ব্যাপার বা মেয়েরা ভাল ভ্রমণকারী নয় জাতীয় ধারণা, যার বশে বউবাচ্চা নিয়ে কোথাও যাওয়াকে লোকে হাস্যকর ঝামেলা ঝঞ্ঝাট বলেই ভাবতে শিখেছিল। এমনকি, ছেলেপিলে বড় হলে সংসারের দায়দায়িত্ব শেষ হলে তবেই যেন মহিলারা যেতে পারতেন দূরে, এবং তাও অবশ্যই ধর্মীয় কারণে। তীর্থ করতে বেরোতেন। অথবা কাশী-বৃন্দাবন-দেওঘর জাতীয় ধর্মীয় স্থানে গিয়ে ডেরাডান্ডা ফেলে কদিন থাকতেন।

নারীর ভ্রমণ যেন সোনার পাথরবাটি। সিলভিয়া প্লাথকে লিখতে হয়েছিল ডায়েরিতে, আমার খুব ইচ্ছে করে খোলা ট্রাকের পিঠে চেপে ঘুরি, আকাশের তারা দেখতে দেখতে পাড়ি দিই এই পথ। সে অভিজ্ঞতা নারীজন্মে আমার হল না। তাই, তাঁর লেখায় বাদ থেকে গেল মনুষ্যজীবনের কত না অভিজ্ঞতার কথা! এই বহিষ্কারের অনেক দূর অব্দি ফলাফল আমরা টের পাই আমাদের এই সমাজে। সুবিশাল এই ক্ষেত্রে নানা ধরনের বহিষ্কার আছে। চিন্তাভাবনা, ইন্টেলেকচুয়াল কর্মসূচি তো অনেক পরের কথা। মূলত সামাজিক ক্ষেত্রের প্রায় প্রতি বিষয়ে মেয়েরা বহিস্কৃত হয়েছেন বা হচ্ছেন আজো। তাঁরা অদৃশ্য, তাদের ভুলে যাওয়া বাধ্যতামূলক। মনেই না পড়া খুব সহজ।

৪

আসলে কেবল আমাদের দেশই নয়। সারা পৃথিবীতেই। আবারো এক ছায়াছবির কথা বলি। এটি ইউরোপের পটভূমিতে। ২০২৩-এ কান ফিল্ম উৎসবে ‘পাম দ’র’ প্রাপ্ত ছবি anatomy of a fall... ছবিতে এক পুরুষের রহস্যময় মৃত্যুর জন্য শুরু হয় ট্রায়াল। বিচার যত না হয়, মিডিয়া বিচারালয়ের বাইরে বিচার করতে থাকে মহিলাকে। কারণ, মেয়েটি স্বাধীন, সফল। স্বাধীনতা ও সফলতা থাকলে আজো, পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তেই মেয়েদের দানবী বানিয়ে দেওয়া হয়। মনস্টার শব্দটি তাই ঘুরে ফিরে আসে এই ছবিতে। বিবাহিত জীবনের স্বাভাবিক টেনশনগুলিকে অস্বাভাবিক করে দেখা হয়। যে কোনো ঝগড়াকেই বানিয়ে তোলা হয় খুনের মোটিভ। এই কাহিনীর পুরুষ ডিপ্রেশনে ভোগেন কারণ তিনি গৃহে থাকেন সন্তানের দেখভালের জন্য। অর্থাৎ রোল রিভার্সাল হয়েছে স্বামী স্ত্রী। সনাতন ভূমিকা উল্টে গেছে। একটি সাক্ষাৎকারে ফরাসি পরিচালক জুস্তিন ত্রিয়েত বলেন: I think that the fundamental question of the film is the question of reciprocity in the couple. I think that also, culturally, women have always been at home, and men have gone out into the world and have had the time to think, to reflect, to have ideas. Women didn’t have that time, because they had to take care of domestic tasks. And so the fact of having a female character who’s a creator, who writes books, who is in the position, at last, of taking time to write, means that it’s the man who suffers. That’s why the argument begins with the question of time. I think it’s something universal and fundamental vis à vis the place of men and women in the family.

সারা পৃথিবীতেই উঠছে পরিবার নিয়ে এইসব নানা প্রশ্ন। নারীকে প্রথমে এক স্বাধীন সত্তা হিসেবে মেনে নিতে না শিখলে, শাঁখা সিঁদুর ঘোমটা ইত্যাদির জটিল জটাজালে আটকে যাবে সমাজ।

উমা

# খাদ্য অখাদ্য

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কি খাব আর কি খাব না রান্না করা পদ
বুঝিয়ে দিলেন চেম্বারে এক খাদ্য বিশারদ,
ভাজাভুজি নয়কো মোটে কোলেস্টেরল বাড়ে
প্রেসার বাড়ায়, শিরায় শিরায় চর্বি জমে পড়ে।
পাঁঠার মাংস চলবে না তো ডিমও হবে বাদ
ট্রাইগ্লিসারাইড জলদি বেড়ে ঘটায় যে প্রমাদ
চিনি এবং মিষ্টি কিছু একটুও তো নয়
শর্করাটা গ্লুকোজ হয়ে ডায়াবেটিসই হয়।
থাকতে ভালো খাদ্য থেকে ছাঁটাই করুন নুন
প্রেশার বাড়ায় এ বস্তুটা আজ থেকে জানুন,
তেল ঘি মাখন বিষের মতো ওসব রাখুন দূরে
সবজি খাবেন সেদ্ধ করে দুবেলা পেট পুরে।
মাছ একপিস খেতেও পারে টক দৈ আর শশা
স্যালাডটা খাবেন অনেকখানি থাকবে শরীর খাসা,
খাবটা কি?
বলুন দেখি—শুধুই হাওয়া জল?
ডায়েটেশিয়ান বলেন এবার হেসে অনর্গল,
'ক্যালোরি তো মাপতে হবে সঠিক হিসেব করে
বুঝিয়ে দেব আসুন আবার চল্লিশ দিন পরে।'

# বিজ্ঞানে নোবেল আর নারী বৃত্তান্ত

শংকর ঘটক

পৃথিবীতে নারী এবং পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। সেই নিরিখে গবেষণার ক্ষেত্রেও নারী এবং পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান সমান হওয়াটাই স্বাভাবিক হত। বাস্তবে সেটা দেখা যায় না। প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত গবেষণার ইতিহাসে নারীর উপস্থিতি পুরুষের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য। প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে গবেষণায় প্রমাণিত সত্যটি হল, নারী-পুরুষের বুদ্ধির তফাতের ধারণাটি সর্বৈব ভ্রান্ত।

**নোবেল পুরস্কারে নারীর স্থান**

আলফ্রেড নোবেলের মৃত্যু হয় ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে। মৃত্যুর আগে তিনি বিস্ববাসীর জন্য একটি পুরস্কারের ব্যবস্থা করে যান—যার নাম নোবেল পুরস্কার। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, শারীরবিদ্যা এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং বিশ্বশান্তির জন্য মোট পাঁচটি পুরস্কারের প্রস্তাব করেন তিনি। পরে এর সঙ্গে যুক্ত হয় আরও একটি পুরস্কার—অর্থনীতিতে ১৯৬৮ সালে। ১৯০১ থেকে এই পুরস্কার প্রদান শুরু হয়। নোবেল পুরস্কার প্রাপকদের মোট সংখ্যা (২০২৩ পর্যন্ত) ৯৬৬২।

এখানে মহিলা নোবেল পুরস্কার প্রাপকদের অংশটুকু বুঝে নেওয়া যাক।

১১০ জন শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন যার মধ্যে মহিলার সংখ্যা ১৯ (১৬.৩%)।

i. ১১৯ জন সাহিত্যে পুরস্কার পেয়েছেন যার মধ্যে মহিলার সংখ্যা ১৭ (১৪.২৮%)

ii. ২৩০ জন চিকিৎসা বিজ্ঞানে পুরস্কার পেয়েছেন যার মধ্যে মহিলার সংখ্যা ১৩ (৫.৬%)

iii. ১৯১ জন রসায়নে পুরস্কার পেয়েছেন যার মধ্যে মহিলার সংখ্যা ৮ (৪.১%)

iv. ২২৪ জন পদার্থ বিজ্ঞানে পুরস্কার পেয়েছেন যার মধ্যে মহিলার সংখ্যা ৫ (১.৮%)

v. ৯২ জন অর্থনীতিতে পুরস্কার পেয়েছেন যার মধ্যে মহিলার সংখ্যা ৩ (২.১৭%)

অর্থাৎ নোবেল পুরস্কার প্রাপকদের তালিকায় মহিলাদের উপস্থিতি পুরুষদের তুলনায় নগণ্য—যা বিজ্ঞানের শাখায় বেশি প্রকট। নোবেল পুরস্কার প্রদান করার বছর (১৯০১) থেকে কুড়ি বছরের ব্যবধানে পুরস্কার প্রাপক মহিলাদের সংখ্যা এরকম: ১৯০১-১৯২০—৪ জন; ১৯২১-১৯৪০ —৫ জন; ১৯৪১-১৯৬১—৫ জন; ১৯৬১-২০০০—১১ জন এবং ২০০০-২০১৬—১৯ জন।

সঙ্গত প্রশ্ন ক্রিস্টোফার (Christopher Connelly): Is the Nobel prize A Boys Mostly club? অতএব, বুদ্ধি সংক্রান্ত গবেষণা যাই বলুক না কেন কার্যক্ষেত্রে মহিলারা কিন্তু পুরুষদের তুলনায় প্রায় অকিঞ্চিৎকর অবস্থানেই রয়ে গেছেন। তিনটি গবেষণাগারকেন্দ্রিক বিষয়, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সাফল্য আরও কম। এই তিনটি ক্ষেত্রে নারীদের অবস্থান এবং সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতা নিয়ে একটু ভাবা যেতে পারে।

এই কারণ অনুসন্ধানের আগে দেখা যাক যাঁরা এই স্বপ্নের পুরস্কারটি পেয়েছেন তাঁদের সামাজিক অবস্থান। প্রসঙ্গত আমরা এখানে মহিলাদের নোবেল পাওয়ার ক্ষেত্রে শুধু বিজ্ঞানের আঙিনাকেই বিবেচ্য রাখব। অন্য ক্ষেত্রগুলি (সাহিত্য, শান্তি ইত্যাদি) আলোচনার প্রসঙ্গ থেকে বাদ রাখব।

**মহিলা বিজ্ঞানীদের সামাজিক অবস্থান**

এখন পর্যন্ত মোট ২৬ মহিলা বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এঁদের মধ্যে চার জন পেয়েছেন তাঁদের জীবনসঙ্গীর সঙ্গে। তাঁরা একসঙ্গে সংসার এবং গবেষণা করেছেন। আরো চমকপ্রদ তথ্য হল—এই ২৬ জন মহিলা বিজ্ঞানীর তিন জন অবিবাহিত ছিলেন। অবিবাহিত এই তিন মহিলা বিজ্ঞানী হলেন— বারবারা ম্যাকলিনটক (Barbara McClintock), রিটা লেভি মন্টালসিনি (Rita Levi Montalcini) এবং জেরট্রুড বি এলিয়ন (Gertrude B Elion)। তিনজনই চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল জয় করেন যথাক্রমে ১৯৮৩, ১৯৮৬ এবং ১৯৮৮ সালে। আরো পাঁচজন বিজ্ঞানীর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে যাঁদের বিবাহিত জীবন ছিল অত্যন্ত স্বল্প সময়ের। এঁরা হলেন আডা ই ইয়োনাথ (Ada E Yonath)—রসায়ন, ২০০৯; রোজালিন ইয়ালো (Rosalyn Yalow)—চিকিৎসা বিজ্ঞান, ১৯৭৭; ক্রিসটিয়ান নুসলিন-ভোলার্ড (Cristiane Nusslein-Volhard) চিকিৎসা বিজ্ঞান, ১৯৯৫; ফ্র্যাঙ্কোয়েস বারি-সিনাউসি (Francoise Barre-Sinaussi)—চিকিৎসা বিজ্ঞান, ২০০৮

এবং এলিজাবেথ এইচ ব্ল্যাকবার্ন (Elizabeth H Blackburn)—চিকিৎসা বিজ্ঞান, ২০০৯। অতএব সংসার করেন নি (বা স্বল্প সময়ের জন্য করেছেন) এমন নোবেল জয়ী মহিলা বিজ্ঞানীর সংখ্যা দাঁড়াল ৮ জন।

জীবনসঙ্গীর সঙ্গে যুগ্ম জয়ী মহিলা বিজ্ঞানীর তালিকায় প্রথমেই যাঁর নাম আসবে তিনি হলেন মেরি স্লোডোওয়াস্কা কুরি। সঙ্গীর নাম পিয়ের কুরি। দুজনে যুগ্মভাবে নোবেল পুরস্কার পান ১৯০৩ সালে। এর পরপরই যে দম্পতির নাম আসবে তাঁরা হলেন আইরিন কুরি এবং ফ্রেডরিক কুরি। পুরস্কারের বছর ১৯৩৫। এরপর ১৯৪৭ সালে যে দম্পতি নোবেল জয় করেন তাঁরা হলেন গ্রেটি কোরি ও কার্ল কোরি। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, এই যুগ্ম গবেষক যুগ্মভাবে ৫০টি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন যেখানে প্রথম নামটি দেওয়া হয়েছে সেই ব্যক্তির কাজের গুরুত্বের ওপর। কখনও গ্রেটির নাম প্রথম অন্যত্র কার্ল-এর নাম প্রথম। এছাড়াও দুজনেই আরো বেশ কিছু গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশ করেন যেখানে হয় কেরি আছেন অথবা কার্ল আছেন। এই গোষ্ঠীর শেষ যুগল মে ব্রিট্ মোসের এবং এড্ভার্ড মোসের। একই স্কুলে পড়লেও পরস্পরের মধ্যে নৈকট্য তৈরি হয় অনেক পরে, কলেজে গিয়ে। দুজনেই এক সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেন শারীরবিদ্যাকে নিজেদের পাঠ্য ও গবেষণার বিষয় করবেন। চমৎকার সম্পর্ক—দুই মেয়ের সংসার। ২০১৪ সালে নোবেল পান। অবশ্য ২০১৬ সালে তাঁদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। কিন্তু দুজনেই আলাদা আলাদা ভাবে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে জানিয়ে দেন যে কর্মক্ষেত্রে তাঁদের এক সঙ্গে চলা বলবৎ থাকবে।

এই গোষ্ঠীর মহিলা বিজ্ঞানীরা তাঁদের জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা পেয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে পুরুষ সদস্য (যেমন পিয়ের কুরি) তাঁর নিজের বিষয় ছেড়ে দিয়ে তাঁর স্ত্রীর বিষয়টিকেই নিজের গবেষণার বিষয় করেছেন। নোবেল জয়ী মহিলা, যার সঙ্গী অন্য পেশায় নিযুক্ত, এক্ষেত্রে প্রথমেই যার নাম আসবে, যিনি পদার্থ বিজ্ঞানে ১৯৬৩ সালে নোবেল জয় করেন, তিনি মারিয়া গোয়েগার্ট মায়ার। বিয়ের পরে উনি পদার্থ বিজ্ঞান পরিত্যাগ করে সংসার করবার কথা ভেবেছিলেন। ওনার সঙ্গী যোশেফ এডওয়ার্ড মায়ার তাঁর স্ত্রীকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে পদার্থবিজ্ঞান চর্চার পেশা তাঁর ছেড়ে দেওয়া চলবে না। এডওয়ার্ড রসায়নের ছাত্র এবং মূলত তাঁর পেশা ছিল অধ্যাপনা। এছাড়া কিছু গবেষণাও তিনি করেছিলেন। এডওয়ার্ডের সক্রিয় সহযোগিতা না পেলে মায়ার তাঁর কর্মজীবনে কতটা সফল হতে পারতেন তা নিয়ে সংশয় থাকতেই পারে।

১৯৬৪ সালে রসায়নে নোবেল জয়ী ডরোথি ক্রোফুট হজকিনের জীবনসঙ্গী টমাস লিওনেল হজকিন। টমাসের সম্পর্কে বলতে গিয়ে যে যে বিশেষণ তাঁর নামের পেছনে থাকে তা দিয়েই মোটামুটি তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়, যেমন 'অসাধারণ মজার গল্প বলিয়ে', 'ভবঘুরে', 'প্রচণ্ড খাদ্য রসিক' ইত্যাদি। টমাস রান্নাবান্নায় খুব পারদর্শী ছিলেন এবং এ ব্যাপারে তাঁর সুনাম ছিল। কোনো নির্দিষ্ট পেশায় নিয়োজিত না থাকলেও মূলত তিনি ছিলেন ইতিহাসবিদ। মার্কসবাদে বিশ্বাসী টমাসের সঙ্গে ডরোথির সম্পর্ক ছিল অসম্ভব সুন্দর। টমাস, ডরোথিকে অনেক বেশি প্রতিভাবান বলে মনে করতেন। অর্থাৎ, এই ক্ষেত্রেও মহিলা বিজ্ঞানী তাঁর পুরুষ সঙ্গীর সক্রিয় সহযোগিতা পেয়েছিলেন।

১৯৭৭ সালের নোবেল বিজয়ী রোজালিন ইয়ালো। জীবনসঙ্গী অ্যারোন ইয়ালো। মূলত পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্রী রোজালিনের গবেষণার বিষয় ছিল জীববিজ্ঞান। অ্যারোনের বিষয় পদার্থবিজ্ঞান। অ্যারোন সম্পর্কে রোজালিনের মন্তব্য, 'আমার এবং আমার কাজের প্রতি অ্যারোনের অফুরন্ত সহযোগিতা আমাকে নিরন্তর এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সকলেরই এমন একজন জীবনসঙ্গী নির্বাচন করা উচিত যে তাঁর জীবন ধারণ পদ্ধতির সঙ্গে মানানসই।' আর অ্যারোনের মন্তব্য রোজালিনকে নিয়ে, 'আমার অতিরিক্ত একজোড়া হাত, চোখ আর মস্তিষ্ক আছে'। সবক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে পুরুষ সঙ্গী স্ত্রীকে সর্বতোভাবেই সহযোগিতা করেছেন। পারস্পরিক সম্পর্কটাও ছিল দায়িত্বশীল বন্ধুর মতো।

নোবেল জয়ী মহিলা বিজ্ঞানীদের মোটামুটি দুটো ভাগে ভাগ করা যাচ্ছে। যাঁরা বিবাহিত তাঁদের সঙ্গীদের সহযোগিতার অভাব কোথাও দেখা যাচ্ছে না। বরং উৎসাহিত করার নজিরই প্রকট। পুরুষ সঙ্গী সক্রিয় বাধা দিচ্ছেন বা স্ত্রীদের উন্নতিতে 'ইগো'তে ভুগছেন—এমন নজির নেই। অন্য ভাগে আছে অবিবাহিত অথবা বিবাহ বিচ্ছিন্নাদের তালিকা। এই প্রসঙ্গে আরেকটি উল্লেখযোগ্য তথ্য—শৈশবাবস্থায় নোবেল জয়ীদের বাবাদের সমর্থন। একদম ব্যতিক্রমহীনভাবেই বেড়ে ওঠার সময় এইসব মেয়েরা তাঁদের বাড়িতে বাবার জোরদার সমর্থন, সহযোগিতা এবং অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। অন্যদিকে মায়েদের ভয়, তাঁদের মেয়েদের বিবাহযোগ্য করে তোলার

পথে শিক্ষা একটা কাঁটা হয়ে না দেখা দেয়। অর্থাৎ, পুরুষ শাসিত সমাজের চিরন্তন নিয়ম মেনেই মেয়েদের সাফল্যের জন্য পুরুষদের সহযোগিতা এবং সক্রিয় সমর্থন একটি প্রধান শর্ত হয়ে দাঁড়ায়।

**পুরুষ নোবেল জয়ীদের স্ত্রীদের ভূমিকা**

মহিলাদের সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে পুরুষদের ভূমিকা যেমন প্রকট হয়ে উঠেছে, উল্টো ক্ষেত্রে তেমনটা দেখা যায় না। ব্যতিক্রম সেখানেই যখন পুরুষ নোবেল জয়ীদের স্ত্রীরা নির্যাতনের শিকার হন। ইতিহাসে তিনটি উদাহরণ খুব স্পষ্ট। ফ্রিত্জ হোবারের স্ত্রীর আত্মহনন, আইনস্টাইন এবং শ্রোডিঙ্গারের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক। এসব নিয়ে বিশদ আলোচনা হয় নি। বিজ্ঞানী ত্রয়ের জীবৎকালেও হয় নি। বর্তমানে যে সব তথ্য প্রকাশিত হচ্ছে, বিশেষত বিশ্বব্যাপী মহিলা স্বাধিকার আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে, আমাদের বিস্মিত করে। এই বিজ্ঞানী ত্রয়ের সঙ্গে আরো এক নির্যাতিতা নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী ম্যাডাম কুরিকে নীচের তালিকাভুক্ত করা হল।

| নাম | জীবনকাল | নোবেল | স্ত্রী/স্বামী |
|---|---|---|---|
| ফ্রিৎস হেবার | ১৮৬১-১৯৩৪ | ১৯১৮ | ক্লারা ইমেরঅর |
| আইনস্টাইন | ১৯৭৯-১৯৫৫ | ১৯২১ | মিলেভা ম্যাকি, এলসা লোয়েনফেল |
| শ্রোডিঙ্গার | ১৮৮৭-১৯৬১ | ১৯৩৩ | আনমেরি বারটেল |
| ম্যাডাম কুরি | ১৮৬৭-১৯৩৪ | ১৯০৩, ১৯১১ | পিয়ের কুরি |

প্রথম তিন জন পুরুষের সাত খুন মাফ। পুরুষ যে! কিন্তু তৃতীয় জন মহিলা। মিথ্যে প্রেমের অভিযোগে চরম নির্যাতিতা। ১৯১১ সালের নোবেল পুরস্কার নেওয়ার জন্য সশরীরে উপস্থিত থাকতে পারলেন না এক শুভানুধ্যায়ীর পরামর্শে। পুরুষদের ক্ষেত্রে ব্যাভিচারের ঘটনায় যাঁরা মুচকি হাসেন তাঁরাই কিন্তু মহিলাদের বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগের সত্যাসত্য বিচার না করেই রে রে করে তেড়ে যান। পুরুষ শাসিত সমাজের এটাই বৈশিষ্ট্য। এইরকম সামাজিক পরিকাঠামোর মধ্যেই কাজ করেছেন মহিলা বিজ্ঞানীরা। সমাজের ধারণা মহিলাদের স্থান রান্না ঘরে, ঘর গৃহস্থালিতে, সন্তান পালনে। বাইরের জগতে নয়—গবেষণাগারে তো নৈব নৈব চ।

**মেয়েদের বেড়ে ওঠার পরিবেশ বনাম নোবেল পুরস্কার**

সাংবাদিক শ্যারন বি ম্যাকগেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ, নোবেল প্রাইজ উইমেন ইন সায়েন্স-এ 'আবিষ্কারের আবেগ (A Passion for Discovery)' শীর্ষক পরিচ্ছেদটি শুরু করেছেন এই বলে, মহিলা নোবেল জয়ীর সংখ্যা 'এত কম কেন?' অর্থাৎ যে পরিমাণ সামাজিক, প্রশাসনিক, পরিকাঠামোগত বাধা ডিঙিয়ে পথ-পরিক্রমা করতে হয় তাতে এই সংখ্যাক মহিলাই বা কী ভাবে বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার জয় করতে সক্ষম হলেন! এ এক আশ্চর্য ঘটনা! আমরা আগের অনুচ্ছেদগুলোতে ঘরে বাইরে মহিলাদের প্রতিবন্ধকতার প্রসঙ্গ আলোচনা করেছি। দেখেছি এঁদের এগোতে গেলে আবশ্যিকভাবেই কোনো পুরুষের সাহায্য প্রয়োজন। যে সমস্ত প্রধান কারণ মহিলাদের সাফল্যের পরিপন্থী তার মধ্যে অবশ্যই অন্যতম প্রধান শিক্ষা ব্যবস্থা। সারা বিশ্বেই লিঙ্গভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল এবং আংশিকভাবে আজও চলছে। মেয়েদের শিক্ষার উদ্দেশ্য ঘর গৃহস্থালি সামলাবার প্রশিক্ষণ। সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার দরজা খোলা থাকত শুধু ছেলেদের জন্য। ইউরোপে ১৯২০ পর্যন্ত মেয়েদের জন্য নির্ধারিত ছিল সেই সব বিদ্যালয় যেখানে তাদের সামাজিক এবং গৃহস্থালির কাজে প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। এই সব বিদ্যালয়কে বলা হত 'ফিনিশিং স্কুল'। যাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার ইচ্ছা থাকত তাঁদের অঙ্ক, বিজ্ঞান, ল্যাটিন এবং গ্রিক ভাষা আয়ত্ত করতে হত গৃহশিক্ষকের ওপর নির্ভর করে, যাতে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় সফল হতে পারেন। স্বাভাবিক প্রক্রিয়া না হওয়ার ফলে এই পথ সাধারণের জন্য দুর্গম ছিল। পদার্থ বিজ্ঞানের শীর্ষ স্থানীয় বিজ্ঞানী লিজ মেইটনার গৃহশিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতি গ্রহণ করতে রাজি হন নি। পিতার একনায়কতান্ত্রিক বিরোধিতার ফলে অ্যালঝাইমার রোগের আবিষ্কারক এবং শীর্ষ স্থানীয় জীব বিজ্ঞানী রিটা লেভি মন্তেলসিনির উচ্চশিক্ষা গ্রহণ শুরু হয়েছিল তাঁর ২০ বছর বয়স হবার পর। মেইটনার অথবা মন্তেলসিনি, সকলেরই পেশাগত জীবনে প্রবেশ করতে তাঁদের সমবয়সী পুরুষদের তুলনায় অন্তত এক দশক দেরি হয়েছে শুধুমাত্র বৈষম্যমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে। পেশাগত জীবনে প্রবেশ করার পরের পথ চলাটি আরো দুর্গম। মেরি কুরি, এমি নোয়েদার, মেইটনারদের মতো বিজ্ঞানীরা কোনো রকম পদ এবং বেতন ছাড়াই বছরের পর বছর কাজ করে গেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আবার ছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অবাধ অধিকার থাকলেও গবেষণার কাজে তাঁদের নিয়োগ করায় নিষেধাজ্ঞা ছিল, বহু ক্ষেত্রে তাঁরা বিয়ে করতেন জীবনসঙ্গীটির সঙ্গে গবেষণাগারে প্রবেশাধিকার পাওয়ার জন্য। প্রবেশাধিকার পাওয়া গেলেও পদ এবং বেতন কোনোটাই পাওয়া যেত না।

এই নিয়মটি মহিলা গবেষকদের ক্ষেত্রে ছিল ভয়ঙ্কর। ১৯৭২ সালে ফেডারেল ইক্যুয়াল অপরচ্যুনিটি অ্যাক্ট (Federal Equal Opportunity Act) লাগু হওয়ার পরে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেই ভয়াবহ পদ্ধতির অবসান হয়। কিন্তু তার রেশ আজও কিছুটা রয়ে গেছে যার প্রমাণ সেদেশে এখনো ৭০ শতাংশ মহিলা বিজ্ঞানী কোনো না কোনো বিজ্ঞানীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ। যেখানে পুরুষদের ছিল বেতন, চাকরির নিরাপত্তা, সম্মান আর মহিলারা সেই পুরুষদের ইচ্ছানুসারে সাহায্যকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। কয়েকটি উদাহরণ না দিলে ওপরের বক্তব্য বিশ্বাস করা কঠিন। গ্রেটি কোরি অধ্যাপনার কাজ পান নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর। জিওপার্ট মেয়ার তিনটি মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন দশক ধরে তিনটি ভিন্ন বিষয়ের ওপর গবেষণা করেছিলেন অবৈতনিক স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে। নোবেল জয় করার পর তিনি বেতন পেতে শুরু করেন। জেরট্রুড এলিয়ন  কয়েক দশক অস্থায়ী কিছু প্রান্তিক কাজ করার পরে রিসার্চ কেমিস্টের চাকরি পান। রোজালিন্ড ফ্র্যাঙ্কলিন-এর মতো বিজ্ঞানীকে নিয়ে বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করে নাটক লেখা হয়েছিল, আবার তাঁরই আবিষ্কৃত তথ্যাবলীকে কাজে লাগিয়ে বা চুরি করে দুই বিজ্ঞানী গবেষণা পত্র প্রকাশ করেছিলেন। রোজালিন্ডের মৃত্যুর পর তাঁরা নোবেল পুরস্কারও পান (১৯৬২)। যদি কোনো মহিলা বিজ্ঞানী তাঁর পুরুষ সঙ্গীর সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী গবেষণা করতেন তবে গবেষণালব্ধ ফলাফলের কৃতিত্ব পুরুষ সঙ্গীকে দেওয়া হত। বহুল প্রচলিত মার্কিন বচন, he was the brains of the team and she was the brawn এর চমকপ্রদ উদাহরণ রোজালিন্ড ইয়ালো। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অন্যান্য গবেষক বিজ্ঞানীরা বলতেন রোজালিন্ড ইয়ালোর আবিষ্কারের পেছনে আছে তাঁর জীবনসঙ্গী অ্যারোন ইয়ালোর মস্তিষ্ক। এই জল্পনা এতটাই প্রসার লাভ করেছিল যে অ্যারোনের মৃত্যুর পর রোজালিন্ডকে ফের নতুন করে তাঁর সুনাম প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল। পেশাগত লিঙ্গ বৈষম্য ছাড়াও এঁদের জাতিবিদ্বেষ, ভাষা, ধর্ম  ইত্যাদি বিষয়েও আক্রান্ত হতে হয়েছিল। এছাড়াও ছিল দারিদ্র, যুদ্ধ, শারীরিক প্রতিবন্ধকতা এবং অসুস্থতা। অতএব সাংবাদিক শ্যারন যখন শ্লেষের সঙ্গে বলেন 'মহিলা নোবেল জয়ীর সংখ্যা এত বেশি কেন?'—তাঁর সঙ্গে সহমত না হয়ে পারা যায় না। একটা ধারণা ছিল—হয়ত আজও আছে—মেয়েদের মস্তিষ্কের গঠন বিজ্ঞান, গণিত ইত্যাদি বিষয়ের উপযুক্ত নয়। রিটালেভি মন্তালসিনি (নোবেল ১৯৮৬), মস্তিষ্ক বিশেষজ্ঞ জানাচ্ছে, জিনগতভাবে পুরুষ এবং মহিলাদের মস্তিষ্ক সর্বতোভাবে একরকম (identical)। বলেছেন, 'তা সত্ত্বেও পুরুষরা গায়ের জোরে তাঁদের ইচ্ছা অনিচ্ছাগুলো মেয়েদের ওপর চাপিয়ে দেয়'। কথাগুলো তিনি বলেছেন এক সাক্ষাৎকারে যখন তাঁর বয়স ১০০ বছর।

১.Gender differences in creative thinking. M. Pilar Matud, C. Rodrý and guez, J. Grand
https://www.researchgate.net/publication/223615151_Gender_differences_in_creative_thinking

২. https://www.nobelprize.org/prizes/facts/nobel-prize-facts/

**এই গল্পের শেষ নেই**

দুটি নোবেল—দুই বিদুষী মহিলা বিজ্ঞানীর উদাহরণ

১. হিলডে পি ম্যানগোল্ড (১৮৯৮-১৯২৪)—গবেষণা করেছিলেন হ্যান্স স্পেম্যান-এর তত্ত্বাবধানে। গবেষণার বিষয়বস্তু জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত। প্রতিভাবান এই বিজ্ঞানী মাত্র ২৬ বছর বয়সে, রান্নাঘরে একটি বিস্ফোরণে নিহত হন। রেখে যান এক শিশুপুত্রকে। তাঁর মৃত্যুর ১১ বছর পরে তাঁর এবং তাঁর তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষকের গবেষণার ভিত্তিতে স্পেম্যান নোবেল পুরস্কার জয় করেন।

২. ফ্রেইডা আর রবিনস (১৮৯৩-১৯৭৩), জর্জ হোয়েট হুইপ্‌ল্‌-এর সঙ্গে যৌথভাবে এক বিশেষ ধরনের রক্তাল্পতার চিকিৎসা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। ১৯৩৪ সালে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় লুইপলকে। যদিও উদ্ভাবন সংক্রান্ত গবেষণা পত্রগুলোতে ফ্রেইডার নাম প্রথমেই উল্লেখিত ছিল। এখানেই শেষ নয়, ফ্রেইডা শিকাগো এবং ক্যালিফোর্নিয়ায় শিক্ষা শেষ করে রচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি ডিগ্রি অর্জন করে। ১৯১৭ থেকে ১৯৫৫ পর্যন্ত একটানা লুইপেলের সঙ্গে গবেষণা করেন। সারা জীবন তিনি অতি নিম্ন পদে নিয়োজিত ছিলেন (Associate in Pathology)।

টিন্ এজ হিরোইন

৩. প্রথম বিশ্বযুদ্ধে 'টিন্‌এজ হিরোইন' নামে খ্যাত ম্যাডাম কুরির কন্যা আইরিন নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচার মাধ্যম তাঁর নামে অকথ্য কুৎসা প্রচারে নেমে পড়ে। আইরিনের অপরাধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে তিনি সোভিয়েত রাশিয়াকে সমর্থন করেছিলেন।

উমা

# জেনেরিক বনাম ব্র্যান্ডেড ওষুধ

ইন্দ্রনীল ঠাকুর

সদ্য কয়েক মাস আগেই ভারতের জাতীয় মেডিকেল কমিশন দেশের চিকিৎসকদের প্রেসক্রিপশনে জেনেরিক মেডিসিনের ব্যবহার বাধ্যতামূলক উল্লেখ করে একটি বিজ্ঞাপ্তি জারি করেছে। এর অন্যথা হলে চিকিৎসকের দণ্ডের কথাও উল্লিখিত আছে সেই বিজ্ঞপ্তিতে। সাধারণ মানুষ তো বটেই, এমনকি বহু চিকিৎসকের মধ্যেও এই বিষয়টি নিয়ে স্বচ্ছ ধারণা নেই। জেনেরিক এবং ব্র্যান্ডের মেডিসিনের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পার্থক্যটিকে তুলে ধরাই এই লেখার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। একটি সহজ উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার হতে পারে। যেমন সাধারণত জ্বরের ওষুধ হল প্যারাসিটামল। এটা আমরা অনেকেই জানি। শুধু নাম নয় অনেকে ওষুধের মাত্রা বা ডোজ সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল। এটি একটি জেনেরিক নাম। অর্থাৎ ওষুধের মূল মলিকিউলটি হল প্যারাসিটামল। এখন বাজারে নানান নামে এটি বিক্রি হয়। যেমন, ক্যালপল, পাইরিজেসিক, ডোলো ইত্যাদি। এগুলো এই হল বিশেষ বিশেষ ওষুধ কোম্পানি নির্ধারিত ব্র্যান্ডের নাম। নামে শুধু নয় দামেও এদের ফারাক রয়েছে। এইগুলোও কিন্তু পুরোপুরি ব্র্যান্ডেড মেডিসিন নয়। বর্তমানে এগুলি ব্র্যান্ডেড জেনেরিক মেডিসিন। তাহলে আসুন জানা যাক যে আসলে সম্পূর্ণরূপে ব্র্যান্ডেড মেডিসিন বলতে ঠিক কি বোঝায়! ধরুন বিশেষ কোনো রোগের জন্য একটি নতুন ওষুধের প্রয়োজনে একটি বিশেষ ওষুধ কোম্পানি গবেষণা শুরু করল। এই গবেষণায় প্রাথমিক সাফল্য মিললেও মানুষের উপর সরাসরি প্রয়োগ করা সম্ভবপর নয়। কারণ মানুষের দেহে ওই বিশেষ ওষুধটির কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থাকতে পারে কিনা সে বিষয়েও গবেষণা জরুরি। আরও সাবধান হতে সরাসরি মানুষের উপর প্রয়োগ না করে ইঁদুর, গিনিপিগ বা ঐ জাতীয় প্রাণীদেহে প্রথমে এই গবেষণা করা হয়। সেখানে সাফল্য মিললে পরবর্তী আরো চার পাঁচটি ধাপে মানুষের দেহে এই গবেষণা করা হয়। একেই বলা হয় ড্রাগ ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল। এই ট্রায়ালে সাফল্য পাওয়া গেলে সেই দেশের drug controlling authority (যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে USFDA, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে DCGI) সেই বিশেষ কোম্পানিকে মোটামুটি কুড়ি বছরের একটি স্বত্ব এবং ছাড়পত্র দেয় যাতে ঐ নতুন গবেষণালব্ধ ওষুধটি বাজারে বিক্রি করে লাভজনকভাবে ঐ গবেষণার, মার্কেটিং, বিজ্ঞাপন ইত্যাদির খরচ তুলে নিতে সক্ষম হয়। এই সময় ঐ বিশেষ ওষুধটির পেটেন্ট থাকে ঐ বিশেষ কোম্পানির কাছে। অন্য কোনো কোম্পানি এই সময় ওই ওষুধটি তৈরি করতে পারে না। এই অবস্থাতেই ওষুধটিকে ব্র্যান্ডেড মেডিসিন বলা যায়। কোম্পানির স্বত্ব উঠে গেলে অন্যান্য কোম্পানিও বিশেষ ওষুধটিকে প্রস্তুত করে বাজারে বিক্রি করতে পারে। এই সময় ওষুধটিকে ব্র্যান্ডেড জেনেরিক মেডিসিন বলা হয়। ওষুধটির সাথেই এত কিছু বিষয় জড়িত থাকার জন্য স্বভাবতই ব্র্যান্ডেড মেডিসিনের দাম অনেকটা বেশি হয়। এতদিনে ওষুধটির post marketing survey সম্পূর্ণ হয়ে যায়। ওষুধটি কার্যকর হলে ইতিমধ্যে চিকিৎসক মহলে পরিচিত হয়ে ওঠে। স্বভাবতই এই সময় গবেষণা, বাজারিকরণ বা বিজ্ঞাপনের আর বিশেষ কোনো প্রয়োজন পড়ে না। ওষুধটির চাহিদা থাকে, এর জোগান দেবার জন্যও অনেক কোম্পানি এগিয়ে আসে। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই ব্র্যান্ডেড জেনেরিক মেডিসিনের দাম অনেক কম হয়। সত্তরের দশকে আমাদের দেশে ওষুধের পেটেন্টের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হলে ভারতবর্ষে নতুন ওষুধ নিয়ে গবেষণা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ভারতে সেই সময় মূলত ব্র্যান্ডেড জেনেরিক মেডিসিনের প্রয়োগ বাড়তে থাকে। পরে অবশ্য সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হলে ভারতবর্ষেও নতুন ওষুধের গবেষণা শুরু হয়।

যদিও পাশ্চাত্যের তুলনায় সেই গবেষণার সংখ্যা নগণ্য। এই নিয়ে নানান অসাধু ব্যবসার অভিযোগও কম নয়। নকল ওষুধ, অনেক চিকিৎসকের উপঢৌকন ইত্যাদি অভিযোগের পুরোটাই যে মিথ্যা একথা বলা যায় না। তবে এটুকু বলাই যায় যে এগুলিই একমাত্র সত্য বা সমস্যার বিষয় নয়। যখন এই ওষুধটি কোনো বিশেষ কোম্পানির নাম গোত্র না নিয়েই একেবারে মূল মকিকুলার আকারে বাজারে বিক্রি করা হয় তখন তাকে শুধুমাত্র জেনেরিক মেডিসিন আখ্যা দেওয়া হয়। ছাত্রাবস্থায় একজন ডাক্তার শিক্ষার্থী ফার্মাকোলজি বিষয়টি অধ্যয়নের সময় এই জেনেরিক ওষুধের নামগুলোর সাথেই পরিচিত থাকে। প্র্যাকটিশ শুরু করার পরে তারা ব্র্যান্ডেড নামগুলোর সাথে পরিচিত হয়। প্যাকেজিং, বিজ্ঞাপন ইত্যাদির কোনো খরচ না থাকায় জেনেরিক মেডিসিনগুলির দামও যথেষ্ট কম হয়। অনেক সময় বিশেষ কিছু কোম্পানি ব্র্যান্ডেড জেনেরিক এবং জেনেরিক এই দুই রকম ওষুধই প্রস্তুত করে থাকে। সব কিছু সঠিক থাকলে ব্র্যান্ডেড, ব্র্যান্ডেড জেনেরিক এবং জেনেরিক এই তিনরকম মেডিসিনেরই একই কর্মক্ষমতা থাকার কথা। জেনেরিক মেডিসিনের দাম কম বলে কম কার্যকর এমন অভিযোগের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। এই অভিযোগের যে কোনো ভিত্তি নেই এমনটাও পুরোপুরি বলা যায় না। এর সবথেকে বড় কারণ হল আমাদের দেশের ড্রাগ কন্ট্রোলিং অথরিটিগুলির তদারকির অভাব। এর সুযোগ নিয়েই অনেক অসাধু ব্যবসায়ী অনেক কম মাত্রার ওষুধ দিয়ে বা নকল প্যাকেজিং করে ওষুধের বাজারে ছেড়ে দেয়। দুর্ভাগ্যবশত ব্র্যান্ডেড জেনেরিক মেডিসিনগুলির ক্ষেত্রেও অনেক সময় এমন অভিযোগের কথা শোনা যায়। একমাত্র সৎ সঠিক নিয়মমাফিক তদারকির মাধ্যমেই এই সমস্যার নিরসন সম্ভব। আসুন এবার দেখি অসাধু চিকিৎসকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত জাতীয় মেডিকেল কমিশনের বার্তা এই সমস্যার সমাধানে কি ভূমিকা পালন করতে পারে। আগেই বলেছি সামগ্রিকভাবে জেনেরিক মেডিসিন প্রেসক্রিপশন সাফল্যের সাথে প্রয়োগ করতে হলে শুধুমাত্র চিকিৎসক প্রেসক্রিপশন করলেই হবে না, ওষুধের দোকানে যে সঠিক গুণগতমানসম্পন্ন ওষুধটি ক্রেতার হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে সে বিষয়ে যথেষ্ট তদারকি এবং সতর্কতার প্রয়োজন আছে। জেনেরিক ওষুধের গুণগত মান পরীক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থা থাকারও যে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে যা বলাই বাহুল্য। একজন চিকিৎসক যে শুধুমাত্র ওষুধের কোম্পানি এবং মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভদের দেওয়া গিফট্-এর জন্যই কোনো মেডিসিন প্রেসক্রিপশন করেন তা নয়। এর পিছনে আরো অনেকগুলি ফ্যাক্টর থাকে যেমন—চিকিৎসক তার ছাত্রজীবনে শিক্ষকদের কাছে কিভাবে চিকিৎসা ব্যাপারটা রপ্ত করেছেন, চিকিৎসক নিজের কোনো বিশেষ ওষুধের উপকার পেয়েছেন কি না, নিজের কোনো নিকটাত্মীয় বা অন্য রোগীদের উপর সেই ওষুধ প্রয়োগ করে কোনো সুফল পেয়েছেন কি না, নতুন গবেষণায় কি বলছে এবং অবশ্যই ওষুধের দাম। আবার দুটি রোগী একই রোগে আক্রান্ত হলেও মানুষ হিসেবে তাদের শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান আলাদা। তাই সে ক্ষেত্রেও প্রেসক্রিপশনের ধরণ আলাদা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আবার গুরুতর মারণাত্মক রোগের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এককালীন ওষুধের দামটাই একমাত্র বিচার্য নয়। দ্রুত রোগ নিরাময় অন্যতম বিচার্য বিষয়। ওষুধের দোকানগুলির ক্ষেত্রেও যা বিধিসম্মত সতর্কীকরণ ব্যবস্থা আছে তার প্রয়োগ যথাযথ হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাস্তার ধারে যত্রতত্র ব্যান্ডেড মেডিসিন খোলার অনুপতি পেয়ে যেখানে সেখানে মেডিসিন কাউন্টার খোলা বন্ধ করতে হবে। সেই জায়গায় সঠিক জেনেরিক মেডিসিনের দোকানের সংখ্যা বাড়াতে হবে। সেক্ষেত্রে কোনো অভাব অভিযোগ থাকলে সেগুলো দেখভাল করার যথেষ্ট ব্যবস্থা থাকতে হবে। পাশাপাশি ব্র্যান্ডেড জেনেরিক মেডিসিনের সহজলভ্যতা কমাতে হবে। আমাদের দেশেও নতুন ওষুধ আবিষ্কারের জন্য পর্যাপ্ত গবেষণাগার গড়ে তুলতে হবে। তবেই অনেক নতুন ওষুধের দাম কমানো যেমন সম্ভব তেমনি নতুন ওষুধ রপ্তানি করে দেশেরও আয় বাড়ানো সম্ভব। সরকার ওষুধে কর কমিয়ে কিছুটা ওষুধের দামের উপর নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করতে পারে। অনেকে গ্রামীণ চিকিৎসকদের উপর নির্ভরশীল। তাদেরও ট্রেনিং এবং সচেতনতার ব্যবস্থা করার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে একটি ওষুধের কোম্পানির সাথে অনেকের রুজি রোজগার জড়িয়ে থাকে। অবশ্য সরকারকে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। নইলে শুধুমাত্র বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। সুতরাং এটা বোঝাই যাচ্ছে যে ব্র্যান্ডেড মেডিসিনের ব্যবহার বন্ধ করা সম্ভব নয়। যেটা সম্ভব তা হল জেনেরিক মেডিসিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা এবং এ বিষয়ে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে যথেষ্ট সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করার আশু প্রয়োজন।

উমা

# ঠেলার নাম বাবা রামদেব
# পাল্টা বিজ্ঞাপন দিয়ে নাকখত

সমীরকুমার ঘোষ

আমাদের এক ভয়ঙ্কর ভেষজ-দুর্বলতা আছে। গাছগাছড়া তথা আয়ুর্বেদে অগাধ ভক্তি আর আস্থা, অনেকটা ঈশ্বরভক্তির মতোই। তার বড় কারণ, মডার্ন মেডিসিনের, যাকে আমরা অ্যালোপ্যাথি ওষুধ নামে চিনি, বিরুদ্ধে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার অভিযোগ। এমনকি অনেকগুলোকে বিষ বলেও মনে করি। তাই ভেষজে ভক্তি। আয়ুর্বেদ ভক্তদের দাবি, এর কোনো ক্ষতিকর প্রভাব নেই। এই তত্ত্ব সামনে রেখেই ব্যবসা শুরু করেছিল সাধনা বা ঢাকা ঔষধালয়। এখন বড় কর্পোরেট সংস্থাগুলো আয়ুর্বেদের নামে লোকের মাথায় কাঁঠাল ভাঙছে। বাসে ট্রেনে হকাররা তেঁতুলের সঙ্গে এটা-সেটা মিশিয়ে হজমিগুলি বানিয়ে মুখশুদ্ধি, চ্যাবনপ্রাস, পাথরহজম, কায়েমচূর্ণ ইত্যাদি নামে বেচছেন। তাতে আমলকি, হত্তুকি, বয়রা, যষ্টিমধু, গোলমরিচ ইত্যাদি কী কী আছে, তার দীর্ঘ তালিকাও পেশ করছেন। 'অ্যান্টাসিড ছুঁড়ে ফেলে দিন, যা মন চায় খান'-এর মতো নিদান দিয়ে দশ-বিশ টাকার প্যাকেট বা শিশি বেচছেন।

সাধারণ মানুষের এই বিশ্বাস আর ভরসাকে পুঁজি করেই ব্যবসা ফেঁদেছেন বাবা রামদেব ও তাঁর কোম্পানি পতঞ্জলি। কয়েক বছরের মধ্যে কোম্পানিগুলোর মুনাফা আকাশ ছুঁয়ে ফেলেছে। এই পথের অন্য বড় কোম্পানিগুলোর ব্যবসা প্রায় লাটে। পতঞ্জলির বড় প্রচারক বাবা রামদেব। টিভিতে নানা যৌগিক প্যাঁচ-পয়জার দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে তাক লাগিয়ে বিশ্বাস অর্জন করেছেন। সর্বোপরি সরকারি ও হিন্দুত্ববাদীদের সমর্থন পেয়ে ব্যবসা তরতরিয়ে পল্লবিত হয়েছে। এ পর্যন্ত ঠিকই ছিল। হঠাৎ করোনার সময় পতঞ্জলি 'করোনিল' নামে এক আয়ুর্বেদ দাওয়াই বাজারে ছাড়ে। সেই সঙ্গে বিজ্ঞাপন দিয়ে দাবি করে, 'তাদের প্রোডাক্ট করোনা প্রতিরোধ করবে ও সারিয়ে দেবে, যা অ্যালোপ্যাথি ওষুধ পারবে না।'

এই ভুয়ো তথ্যে ভরা বিজ্ঞাপন দেওয়ার পর কেন্দ্রের বন্ধু সরকার যথারীতি চোখ বন্ধ করে বসেছিল। আয়ুষ মন্ত্রকও নাকে দু ফোঁটা বেশি তেল দিয়ে নিদ্রা যায়। শেষমেশ ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন মামলা করে বসে। তাদের দাবি, পতঞ্জলি অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা এবং চিকিৎসকদের অপমান করেছে। কোভিড ১৯-এর ভ্যাকসিন ও ওষুধ নিয়েও এই সংস্থা বিভ্রান্তিকর প্রচার করেছে। আইএমএ-র বক্তব্য ছিল, পতঞ্জলির করা দাবিগুলি আদৌ সত্যি বলে প্রমাণিত নয় এবং তা ১৯৫৪ সালের ড্রাগস অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডি আইন এবং ২০১৯ সালের উপভোক্তা সুরক্ষা আইনের মতো আইনগুলিকে লঙ্ঘন করেছে।

এই মামলার জেরে দেশের শীর্ষ আদালত কড়া মনোভাব নেয়। পতঞ্জলি আয়ুর্বেদ সংস্থার 'বিভ্রান্তিকর এবং মিথ্যা' বিজ্ঞাপন মামলায় রীতিমতো চাপে পড়ে যান যোগগুরু। ৯ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের কাছে হলফনামা দাখিল করে নিঃশর্ত ক্ষমা চান রামদেব। কিন্তু বিচারপতি হিমা কোহলি ও বিচারপতি এহসানউদ্দিন আমানুল্লাহর বেঞ্চ তাতে মোটেই সন্তুষ্ট হয় না। হলফনামাকে 'কাগজের টুকরো' বলে মন্তব্য করেন বিচারপতি হিমা কোহলি। তার পরেই রামদেব ও অন্যদের উদ্দেশে বলেন, 'আপনারা পরিণতির জন্য প্রস্তুত থাকুন। আমরা আপনাদের ছাড়ছি না।' ওই একই দিনে পতঞ্জলির ম্যানেজিং ডিরেক্টর আচার্য বালকৃষ্ণও নিঃশর্তে ক্ষমা চান। কিন্তু এই ক্ষমা চাওয়াকেও প্রচার পাওয়ার চেষ্টা বলে পর্যবেক্ষণ শীর্ষ আদালতের। বেঞ্চ জানিয়েছে, 'আমরা

আপনাদের হলফনামা গ্রহণ করব না, কারণ, আপনারা যা করেছেন, ইচ্ছাকৃতভাবেই করেছেন। যা বারবার আদেশ লঙ্ঘন বলেই আমরা মনে করি। এমনকি এই আদালতের সামনে যাতে হাজিরা দিতে না হয়, তার জন্য ভুয়ো প্লেনের টিকিট দেখিয়ে বলেছেন যে, তাঁরা দেশে নেই।' ফলে এই 'ক্ষমাপ্রার্থনা' আদৌ আন্তরিক কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিচারপতি। পতঞ্জলির প্রচুর টাকা বাঘা আইনজীবী মুকুল রোহতগিকে নিয়োগ করে। তিনি আদালতে বলেন, 'মানুষ জীবনে ভুল করে।' বেঞ্চের পাল্টা প্রশ্ন, 'আমাদের আদেশের পরেও ভুল করবে? আমরা এতটা উদার হতে পারব না। হতে চাইও না। কারণ সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন।' বিচারপতিদের বক্তব্য, 'We will rip you apart'. ১০ তারিখের মামলায় আদালত স্পষ্ট জানায়, এই হলফনামায় আদৌ সন্তুষ্ট নয় তারা। কারণ, এটি আদালতে পেশের আগেই সংবাদমাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে। তার মানে রামদেবরা আসলে ক্ষমা চাওয়ার থেকে প্রচারে আগ্রহী। এই মামলায় কেন্দ্রের কাছে হলফনামা দাবি করে শীর্ষ আদালত। কেন্দ্র হলফনামা দিয়ে বলেছে, অ্যালোপ্যাথি না আয়ুর্বেদ, কোন চিকিৎসা গ্রহণ করবেন, তা একান্তই রোগীর নিজস্ব ব্যাপার। শীর্ষ আদালতে দেওয়া হলফনামার কেন্দ্র এও জানায়, কোনও 'বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন' নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। আদালত বলে, 'সরকার চোখ বন্ধ করে বসে আছে। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। রাজ্য সরকার পতঞ্জলির সহযোগী হিসাবে কাজ করছে।' উত্তরাখণ্ডের সরকারি অফিসার নিঃশর্ত ক্ষমা চাইলেও তাতে নরম হয় না শীর্ষ আদালত। কারণ ২০১৮ সালে পতঞ্জলির বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠার পরও উত্তরাখণ্ড সরকার কোনো ব্যবস্থা নেয় নি। আদালত, হরিদ্বারের সমস্ত জেলা আয়ুর্বেদ ও ইউনানি অফিসারকে নোটিশ পাঠায়। পতঞ্জলির পর রাজ্য লাইসেন্সিং অথরিটিও সুপ্রিম কোর্টের তোপের মুখে পড়তে চলেছে। অভিযোগ, ইচ্ছে করে তারা চোখ বন্ধ রেখেছিল। সংস্থা ড্রাগস অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিস (অবজেকশনেব্‌ল অ্যাডভার্টাইজমেন্ট) অ্যাক্ট, সংক্ষেপে ডিএমআর না মানা সত্ত্বেও বছর ঘুরলেও রাজ্য সরকার কোনো ব্যবস্থা নেয় নি। রাজ্য সরকারের পক্ষে হাত জোড় করে ক্ষমা চেয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়।

শীর্ষ আদালতে বেশ প্যাঁচে পড়েছেন যোগগুরু রামদেব ও তাঁর সংস্থা পতঞ্জলি। কোনোভাবেই পার পাচ্ছেন না। 'বিভ্রন্তিকর বিজ্ঞাপন' মামলায় জনসমক্ষে ক্ষমা চাইতে রাজি বলে জানান, রামদেব ও তাঁর সহযোগী আচার্য বালকৃষ্ণ। কিন্তু বেঞ্চ বলে, 'আপনি এতটাও নিষ্পাপ (ইনোসেন্ট) নন। দেশে যোগের বিস্তারে আপনার একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু তাই বলে এটা নয় যে, করোনা-কালে বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন দিয়ে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করতে হবে।' কেন্দ্রীয় সরকারও কীভাবে এই ঘটনাকে তাদের নজরে আনল না, তা নিয়েও বিস্ময় প্রকাশ করে আদালত। দায়সারা হলফনামা দেওয়ায় ১০ এপ্রিলের শুনানিতে তীব্র ভর্ৎসনার মুখে পড়েন দুই কর্তা। ফলে তাঁদের ১৭ তারিখ সশরীর হাজির হতেই হয়। আয়ুর্বেদকে তুলে চিকিৎসাকে কেন হেয় করা হয়েছে, তা জানতে চান বিচারপতি আমানুল্লা। রামদেব জানান, ভবিষ্যতে এরকম কাজ আর হবে না। এতে বিচারপতিরা নরম হন না। ২৩ তারিখ হলফনামা পেশ করে ক্ষমা চাইতে নির্দেশ দেন। রামদেব জানান, তিনি বিজ্ঞাপন দেবেন তাঁর বিভ্রান্তিকর প্রচারের বিরুদ্ধে। কিন্তু দায়সারাভাবে ছোট করে বিজ্ঞাপন দিয়েও রেহাই পান না রামদেব। তাঁদেক নির্দেশ দেওয়া হয়, যে মাপে ওষুধের বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, সেই মাপেই ক্ষমা চাওয়ার বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে। রামদেবেকে সেটাই করতে হয়।

এ প্রসঙ্গে কেরলের এক চোখের ডাক্তার তথা সমাজকর্মী ডাঃ কে ভি বাবুর ভূমিকার কথাও উল্লেখ্য। তিনি পতঞ্জলির বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন নিয়ে দু বছর ধরে লড়ে গিয়েছেন। তাঁর এক বন্ধুর মা তাঁর কাছে গ্লকোমার চিকিৎসা করাতে করাতে হঠাৎ বন্ধ করে দেন। প্রায় দেড় বছর পর তিনি যখন ফিরে আসেন, তখন তাঁর চোখ প্রায় অন্ধ। এই সময়কালে উনি আয়ুর্বেদ চিকিৎসা শুরু করেছিলেন। এই সময়কালে উনি আয়ুর্বেদ চিকিৎসা শুরু করেছিলেন। পতঞ্জলির বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপনের কারণেই এই অবস্থা। তাই কে ভি বাবু আয়ুষ মন্ত্রকে নালিশ করেন। এবং লাগাতার লড়াই চালাতে থাকেন। আয়ুষ মন্ত্রক নানা টালবাহানা করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত থাপ্পড়টা খেতে হল সুপ্রিম কোর্টের কাছে।

উমা

**সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত**
**প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া পত্রিকার কোনও অংশের কোনও মাধ্যমের সাহায্যে কোনওরকম পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত না মানলে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। — সম্পাদকমণ্ডলী**

# শিশুকে খাওয়াতে টিভি থেকে মোবাইল: নতুনতর বিপদের আহ্বান নয় তো?

মোহিত রণদীপ

আমরা চাই শিশুরা সুস্থ, সবল চেহারা নিয়ে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে উঠুক। কিন্তু, এই সুস্বাস্থ্যের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে নানাবিধ পুষ্টিগুণসম্পন্ন খাবার শিশুকে দেওয়া প্রয়োজন। মূলত এই কারণে আমাদের অনেকের মনেই সদ্যোজাত শিশুর খাওয়া এবং ওজন নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তা নিয়ে থাকে। বাচ্চা খেতে চাইছে না, ওজন একটুও বাড়ছে না! এরকম প্যাংলাই থেকে যাবে! অন্য বাচ্চারা তো দিব্যি নাদুশনুদুশ! এমন হাজারো ভাবনা সদ্যোজাত শিশুর খাওয়াদাওয়া নিয়ে আমাদের পরিবারগুলোতে চোখে পড়ে। ফলে শুরু হয় যেনতেন প্রকারে খাওয়ানোর হরেকরকম প্রয়াস। একেবারে শৈশবে শিশুকে ঝিনুক দিয়ে খাওয়ানো শুরু হয়, তখন যুক্তি থাকে পর্যাপ্ত মাতৃদুগ্ধ না থাকার ফলে। ঝিনুক দিয়ে খাওয়ানোর একটা সুবিধা আছে, অল্প একটু ঠোঁট ফাঁক করলেই অনেক পরিমাণ দুধ ঢেলে দেওয়া যায়। এতে শিশু কতটা স্বস্তি পায় তা আমরা বুঝতে চাই না তেমন করে, কিন্তু আমাদের অনেকটা স্বস্তি ও তৃপ্তি আমাদের স্থির করে দেওয়া পরিমাণ অনুযায়ী খাওয়াতে পেরে। আমাদের উদ্বেগ-জাত জেদের কাছে শিশু এক সময় অসহায়ের মতো আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। খাওয়ানোর নামে জোরজুলুমের এমন উদাহরণ এই ধরিত্রীর প্রাণীজগতে মানুষ ব্যতিরেকে অন্য কোনও প্রজাতির মধ্যে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

**বহু শিশুর মধ্যে অনেক সময় অস্থিরতা, অতি চঞ্চলতা দেখা দিতে শুরু করে। এক জায়গায় স্থির হয়ে বসতে পারে না। কোনও কিছুতেই সে মনঃসংযোগ তেমন করতে পারে না। একটুতেই বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় তার মন। কেন? একদিকে শিশুর প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্যালরি-সম্পন্ন খাবার তাকে খাওয়ানোর ফলে তৈরি হচ্ছে তার মধ্যে বিপুল এনার্জি, অন্য দিকে ডিজিটাল স্ক্রিনে দ্রুতগতিসম্পন্ন কার্টুন নেটওয়ার্ক বা ইউটিউব ভিডিও কিংবা গেমস তার মধ্যে জাগিয়ে তুলছে অতি চঞ্চলতা। ফলে শিশুর মধ্যে অস্থিরতা ও অমনোযোগের সমস্যা দেখা দিচ্ছে বহু ক্ষেত্রে।**

শিশু কেন খেতে চাইছে না তা বোঝার ধৈর্য বা প্রয়াস আমাদের মধ্যে অনেক সময় থাকে না। সাধারণভাবে শিশুদের খাদ্যে অনীহার মূলে যে কারণগুলো নিহিত থাকে সেগুলো একটু দেখে নিতে পারি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খিদে পাওয়ার আগেই শিশুকে আমরা কিছ-না-কিছু খাইয়ে দিই। এতে খিদের অনুভূতি থেকে বঞ্চিত হয় বহু শিশু। ফলে তার খিদে পায় না, খেতেও চায় না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে শিশুর শারীরিক অসুস্থতার কারণেও খিদে কমে যায়। আবার অনেক সময়, নিত্যদিন একই রকম খাবারে অরুচি তৈরি হতে পারে। কখনও আবার খাবারের স্বাদ যদি পছন্দ না হয়, তখনও শিশু খেতে চায় না। কোনও সময় শিশু অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ততার কারণেও খেতে না চাইতে পারে। আবার অনেক সময় অনিচ্ছার কারণে খেতে চাইছে না শিশু, এমনও ঘটে থাকে। এই অনিচ্ছার মূলে থাকতে পারে—জোর করে খাওয়ানোর বিরুদ্ধে শিশুর প্রতিরোধ, না খেতে চাওয়ার মাধ্যমে অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা; এছাড়াও থাকতে পারে অন্য কোনও মনস্তাত্ত্বিক কারণ। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই পৃথিবীর সর্বত্র শিশুবিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমাজের নিদান হল—খিদে পেলে, খেতে চাইলে, খাবার জন্য কান্না জুড়লে শিশুকে খেতে দেওয়া। শিশু খেতে না চাইলে খাবার তুলে রাখার কথা বলেন তাঁরা। কিন্তু এই নিদান সত্ত্বেও তাঁদের যাবতীয় আপত্তিকে অগ্রাহ্য করে হৃষ্টপুষ্ট গ্ল্যাক্সো বেবিতে রূপান্তরের সর্বাত্মক প্রয়াস আমাদের চলতেই থাকে। এইভাবেই শিশুকে শৈশবের শুরুর পর্বেই জেদের প্রথম পাঠ আমরা নিজেরাই নিজেদের অজান্তে দিয়ে থাকি। শিশু একটু বড় হতেই ধীরে ধীরে খুঁজে পায় প্রতিবাদের-প্রতিরোধের নানা অস্ত্র। প্রথমে ছিল অতিরিক্ত খাবার উগড়ে দেওয়া, পরের ধাপে আমরা তার মুখে খাবার দেওয়ার পরেই সে মুখ বন্ধ করে নেয়, খাবার না গিলে মুখের মধ্যেই রেখে দেয় যতক্ষণ না আমরা নিরস্ত হই। আমাদের সেই শেখানো জেদই হয়ে ওঠে আমাদের জব্দ করার অমোঘ অস্ত্র। আমরা অনেক ক্ষেত্রেই তার এই অমোঘ অস্ত্রে হাল ছাড়তে বাধ্য হই, খুঁজতে থাকি শিশুকে খাওয়ানোর

নিত্যনতুন উপায়। একসময় টেলিভিশনের কার্টুন নেটওয়ার্ক হয়ে ওঠে মুশকিল আসান। কার্টুনের টম অ্যান্ড জেরির লড়াই সে উপভোগ করতে শুরু করে এক মনে। সে তখন টেলিভিশনের ওই কার্টুন আর খাবার দুটোই গিলতে থাকে গোগ্রাসে। আমারাও স্বস্তি পাই, তৃপ্ত হই।

এরপর ক্রমশ সহজলভ্য হয়ে ওঠে মুঠোফোন। মুঠোফোন বা মোবাইল ফোন আমাদের বর্তমান জীবনযাত্রায় অপরিহার্য। কিন্তু এর অপব্যবহার এবং তার নানাবিধ পরিণতি নিয়ে ভাবনা জরুরি। শিশুকে টেলিভিশন কিংবা মোবাইল দেখিয়ে খাওয়ানোর ক্রমবর্ধমান প্রবণতা বিষয়টিকে নিয়ে ভাবতে বাধ্য করল। শিশুসন্তান খেতে চায় না, এ অভিযোগ কান না পাতলেও শোনা যায় আর্থিকভাবে সচ্ছল, বা ততখানি সচ্ছল নয় এমন পরিবারেও। ফলে, তাদের জোর করেই খাওয়ানো হয়। তার সহজতম আয়ুধ হল শিশুটির হাতে মোবাইল ফোন ধরিয়ে দেওয়া। এক-দেড় বছর বয়সী শিশু একদৃষ্টে দেখতে থাকে কখনও কার্টুন, কখনও অন্য কোনও ভিডিও। ক্রমশ বাড়তে থাকে তার ফোনের মধ্যে ডুবে থাকা।

শুধু খাওয়ানোর সময় নয়, শিশুকে সামলানোর পুরো দায়িত্বই নিয়ে নেয় সেই ফোন। বাইরের জগতের সঙ্গে শিশুটির সম্পর্ক ক্রমশ কমতে থাকে। ফোন সামনে থাকলে কারও ডাকে সে আর সাড়া দেয় না। শৈশবেই আসক্তির বেশ কিছু লক্ষণ ফুটে ওঠে শিশুর মধ্যে। ফোন হাতে না পেলেই কাঁদে। জন্মের পর থেকে তিন বছর বয়স পর্যন্ত শিশু আর পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে চারপাশের জগৎকে চিনতে, অনুভব করতে শেখে। এই সময়েই তার সঙ্গে থাকা মানুষজনের কথাবার্তা সে মন দিয়ে শোনে, কথার অর্থ নিজের মতো করে বুঝতে শেখে, অন্যদের ডাকে হাসির মাধ্যমে সাড়া দিতে শেখে, এর পর ধ্বনি থেকে একটু-একটু করে তার সামনে বারংবার উচ্চারিত শব্দগুলোর মধ্যে থেকে একটি দু'টি শব্দ বলতে শেখে, ধীরে ধীরে সে গোটা বাক্য বলতে শেখে। কোনও কারণে এই বয়ঃসীমার শিশু যদি বঞ্চিত হয় তার চারপাশের জগৎকে তার পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আবিষ্কারের সুযোগ থেকে এবং তার চার পাশের মানুষের সঙ্গে কথোপকথনের সুযোগ থেকে, সে ক্ষেত্রে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ প্রক্রিয়া ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে।

বর্তমানে এই সমস্যা ক্রমশ গুরুতর আকার নিতে চলেছে। দেখা যাচ্ছে, আমাদের চারপাশের অনেক শিশুর ভাষার বিকাশ তার বয়সের সাপেক্ষে ঠিকমতো হচ্ছে না। শব্দ ও বাক্য যে বয়সে বলতে শেখার কথা, বহু শিশুই তা শিখছে না। অনেক ক্ষেত্রে কথা বলার সময় চোখে চোখ রেখে কথা বলছে না। কখনও কখনও এমন কিছু শব্দ উচ্চারণ করছে, যার অর্থ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এই লক্ষণগুলো অনেকাংশে মিলে যায় 'অটিজম স্পেকট্রাম' নামক অটিজনের বিস্তৃত পরিসরের মধ্যে কোনও এক বা একাধিক বিশেষ ধরনের সমস্যার সঙ্গে। যদিও, ক্লাসিক্যাল অটিজম বলতে যা বোঝায়, তার সঙ্গে জিনের সম্পৃক্ততাই বেশি বলে মনে করা হয় বৈজ্ঞানিক চর্চার পরিসরে; এখানে উল্লিখিত লক্ষণগুলোর ক্ষেত্রে পরিবেশের ভূমিকাই মুখ্য। তবে একটা আশঙ্কা থেকে যায়, বংশত বৈশিষ্ট্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকা জিন অনেক সময় পরিবেশগত কারণে প্রকাশ পায়।

আমরা জানি না কোন শিশুর মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় আছে 'অটিজম স্পেকট্রাম'-এর কোনও প্রবণতা। সেই শিশুর পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রথম শৈশবে বাইরের জগতের আদানপ্রদানের, সংযোগের, কথোপকথনের সুযোগ যদি না ঘটে, তা হলে তার মধ্যে অন্য আর পাঁচ জন শিশুর তুলনায় অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা হয়ত বেশিই থাকে।

সম্প্রতি এই সমস্যাটিকে কেউ কেউ 'ভার্চুয়াল অটিজম' নামে উল্লেখ করছেন। সমস্যাটি সেই শিশুদের মধ্যে বেশি দেখা যাচ্ছে, যারা প্রথম শৈশব থেকেই ডিজিটাল নানা সামগ্রীর মধ্যে অনেকটা সময় ডুবে থাকছে। এই সমস্যায় আক্রান্ত শিশু ইশারা এবং হাবভাবের মাধ্যমে সেরে নিতে চাইছে তার প্রয়োজনীয় কথাবার্তা। অবশ্য শিশুদের ইন্দ্রিয়-বিকাশের অন্তরায় হওয়ার ক্ষেত্রে খাওয়ানো অনুষঙ্গ ছাড়াও আরও বহুবিধ কারণ থাকতে পারে। এ ক্ষেত্রে শিশুর ইন্দ্রিয় ও সংবেদনের বিকাশ সম্পর্কে আমাদের অসচেতনতার ভূমিকা অনেকখানি। তবে আশার কথা, যে শিশুরা শৈশবের প্রথম পর্বে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বাইরের জগতের সঙ্গে সংযোগ গড়ে তুলতে পারে নি, তারা যদি আবার সবার সঙ্গে মেলামেশার, কথোপকথনের পর্যাপ্ত সুযোগ পায়, তা হলে তাদের বেশির ভাগই সমস্যা কাটিয়ে উঠে প্রয়োজনীয় কুশলতা ফিরে পেতে পারে। এমন কিছু উদাহরণও চোখে পড়েছে।

বহু শিশুর মধ্যে অনেক সময় অস্থিরতা, অতি চঞ্চলতা দেখা দিতে শুরু করে। এক জায়গায় স্থির হয়ে বসতে পারে না। কোনও কিছুতেই সে মনঃসংযোগ তেমন করতে পারে না। একটুতেই বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় তার মন। কেন? একদিকে শিশুর প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্যালরি-সম্পন্ন খাবার তাকে

খাওয়ানোর ফলে তৈরি হচ্ছে তার মধ্যে বিপুল এনার্জি, অন্য দিকে ডিজিটাল স্ক্রিনে দ্রুতগতিসম্পন্ন কার্টুন নেটওয়ার্ক বা ইউটিউব ভিডিও কিংবা গেমস তার মধ্যে জাগিয়ে তুলছে অতি চঞ্চলতা। ফলে শিশুর মধ্যে অস্থিরতা ও অমনোযোগের সমস্যা দেখা দিচ্ছে বহু ক্ষেত্রে। এই অস্থিরতা ও অমনোযোগ সেই বয়সে তার যা কিছু শেখার কথা, সেই শেখার ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধক হয়ে উঠছে।

এ যাবৎ মানুষ যা কিছু সৃষ্টি করেছে, সবটাই কল্পনার ডানা মেলে। শিশুর জগৎ স্বভাবতই কল্পনাময়। সেই কল্পনার জগৎ কেড়ে নিচ্ছে শিশুদের ডিজিটাল-নির্ভরতা। তা শিশুর কল্পনাকে সঙ্কুচিত করে, ভাবার অভ্যাস কমতে থাকে। শিশু যখন কল্পনা করতে ভুলে যাবে, তখন তার সৃষ্টিশীলতাও নিঃশেষ হয়ে আসবে।

**কৃতজ্ঞতা:** বিশিষ্ট মনোচিকিৎসক ডাঃ সত্যজিৎ আশ, বিশিষ্ট শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ অমরেশ দে, মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে গবেষণারত ডাঃ প্রদীপ্ত রায় এবং বিশিষ্ট স্পেশাল এডুকেটর লিপিকা ভট্টাচার্য। এঁদের গুরুত্বপূর্ণ মতামতের জন্য অশেষ ধন্যবাদ।

উমা

# সুবর্ণরেখা নদী তীরবর্তী তিনটি রাজ্যের মৎস্যজীবী মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

মৃন্ময় ঘোড়ই

সুবর্ণরেখা নদী ভারতবর্ষের একটি অন্যতম প্রসিদ্ধ নদী। এই বৃষ্টি-নির্ভর নদী পূর্ব প্রভাবিত আন্তঃরাজ্য নদীগুলির মধ্যে অন্যতম। এটি ঝাড়খণ্ড রাজ্যের রাঁচি জেলার নাসার গ্রামের ছোট নাগপুরের মানভূমির কাছে প্রায় ৬০০ মি. উচ্চতা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। নদীটির মোট দৈর্ঘ ৩৯৫ কিমি, নদীটির প্রধান উপনদীগুলি হল কাঞ্চি, খারকাই এবং কারকরি। এই নদীটি ঝাড়খণ্ড পূর্ব সিংভূম জেলা থেকে উৎপত্তি হয়ে পশ্চিমবঙ্গের অবিভক্ত পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা বর্তমানে ঝাড়গ্রাম জেলা এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রাম, ভসরাঘাট ও দাঁতন সদর ঘাটের ৮৩ কিমি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলার দীর্ঘ ৬৪ কিমি পথ অতিক্রম করে কীর্তনিয়া বন্দরের মধ্য দিয়ে তালসারির নিকটে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে।

এই নদীটির একটি সুদীর্ঘ ইতিহাস হল রাঁচির কাছে পিসকা নামে একটি গ্রামে নদীর উৎপত্তিস্থলের কাছে সোনা খনন করা হয়েছিল। এই কারণেই এর নামকরণ সুবর্ণরেখা। যার অর্থ 'সোনার রেখা'। কথিত আছে যে, নদীর তলদেশে সোনার খোঁজ পাওয়া যেত, ফলে সেখানকার অধিবাসীগণ বালুকাময় স্তরে সোনার কণার সন্ধান চালিয়ে যেত। সুবর্ণরেখার পথ ধরে উৎস থেকে মোহনায় পৌঁছনোর বিবরণ খুবই দুর্গম এবং সেই বিবরণের সাথে জড়িয়ে রয়েছে তিনটি রাজ্যের মানুষের জীবনযাত্রা, আবেগ ও ভালোবাসা।

এই নদীর তীরে কতকগুলো ড্যাম রয়েছে—তার মধ্যে অন্যতম হল গেতুলসুদ ড্যাম। এছাড়াও রয়েছে জামসেদপুরের কাছে চাণ্ডিল ড্যাম, ঘাটশিলায় গালুডি ব্যারেজ। আমাদের রাজ্যে কেশিয়াড়ির কাছে ভসরাঘাট ব্যারেজ নির্মিত হওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও তা বাস্তবায়িত হয় নি।

নদীপথের বর্ণনা — ঝাড়খণ্ডের রাঁচিসহ বিস্তীর্ণ এলাকার পানীয় জলের উৎস গেতুলসুদ ড্যাম, যা সুবর্ণরেখার জল দ্বারা পুষ্ট। এই ড্যাম থেকে বেরিয়ে নদীটি হুড্রু ফল্‌সে ৯৮ মিটার নীচে পড়েছে সুবর্ণরেখা। তারপর জামসেদপুর, চাণ্ডিল, ঘাটশিলা, জামশোলা, গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রাম, ভসরঘাট, গরদপুর, দাঁতন, সোনাকোনিয়া প্রভৃতি গ্রামগুলির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে উড়িষ্যা রাজ্যে প্রবেশ করে জলশ্বরের রাজঘাটের পাশ দিয়ে কীর্তনিয়া বন্দরে তালসারি মোহনায় গড়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। নদীর এই দীর্ঘপথ পরিক্রমায় ছড়িয়ে রয়েছে অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং গড়ে উঠেছে সুন্দর সুন্দর পর্যটন আবাস। ঘাটশিলা একটি অভূতপূর্ব স্থান যা সুবর্ণরেখার নদীর তীরে অবস্থিত এবং চারপাশে পাহাড়, জলপ্রপাত এবং অরণ্যে সমৃদ্ধ এলাকা। এখানে প্রধান আকর্ষণীয় স্থানগুলির মধ্যে রয়েছে ফুলডুংরি পাহাড়, বুড়ুডি লেক, ধরাগিরি জলপ্রপাত এবং এবং রাঙ্কিণী মন্দির।

**মৎস্যজীবী মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা** — সুবর্ণরেখা নদীর তীরবর্তী জনপদগুলি অর্থাৎ ঘাটশিলা, জামশোলা, গোপীবল্লভপুর, হাতিবাড়ি, দেউলবাড়, ভসরাঘাট, দাঁতন সদরঘাট,

সোনাকনিয়া, রাজঘাট প্রভৃতি গ্রামগুলো বেঁচে রয়েছে নদীর জলকে সম্বল করে। সেচের জল, পানীয় জল, বিদ্যুৎ উৎপন্ন, ঘাটশিলা ও জামসেদপুর সন্নিহিত কপার ও স্টিল কারখানা—পৃথিবী বিখ্যাত সবই গড়ে উঠেছে এই নদীর জলের উপর নির্ভর করে।

এখানকার মানুষের প্রধান উপজীবিকা কৃষিকাজ। তবে নদী তীরবর্তী গ্রামগুলির প্রধান জীবিকা হল মাছ ধরা, বাজারে বিক্রি করা এবং তার থেকে জীবিকা অর্জন করা। যে সমস্ত সম্প্রদায় মূলত মাছ ধরার কাজে সারা বছর নিয়োজিত থাকে তারা হল—

১. বাগদি: এই সম্প্রদায়টি মূলত পশ্চিমবঙ্গস্থিত সুবর্ণরেখা নদী তীরবর্তী বাসিন্দা। তারা প্রধানত মৎস্য আহরণ, বাজারিকরণ, জাল তৈরি, নৌকা তৈরি প্রভৃতি কাজে সারাবছর নিযুক্ত থাকে।

২. কেওট: এই সম্প্রদায়টি পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার নদী তীরবর্তী এলাকায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে। এরাও মৎস্য আহরণ ও নৌকা চালাবার সাথে যুক্ত থাকে।

৩. তিয়ারি: এই সম্প্রদায়টি মূলত তিনটি রাজ্যে মৎস্যজীবী হিসাবে বিবেচিত হয় এবং প্রধানত নদীর তীরবর্তী এলাকায় বসবাস করে।

৪. মাহিষ্য: মূলত পশ্চিমবঙ্গ তীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে এই সম্প্রদায়ের মানুষজন বাস করে।

এছাড়া ওড়িশায় অবস্থিত মৎস্যজীবী সম্প্রদায়গুলি হল চাঁসি, নলিয়া, গুড়িয়া, বেহুরা ও কাঁটাই প্রভৃতি। তাছাড়া অন্যান্য ছোট সম্প্রদায় যেমন রায়সিং, সবর এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত যারা নদীর তীরবর্তী এলাকায় মৎস্য আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে।

এই সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষজন নদীর মাছে উৎপাদন বৃদ্ধি বা হ্রাসের উপর নির্ভরশীল। যে বছরে নদীর উৎপাদন হ্রাস পায়, সে সব বছরে তারা নিদারুণ দুঃখকষ্টের মধ্যে জীবন কাটায়। সেই সমস্ত বছরগুলিতে তারা জঙ্গলের শুকনো কাঠ, শাল পাতা, কেন্দু পাতা, বাবুই ঘাসের দড়ি এবং বিকল্প হিসাবে হাঁস, মুরগি ও ছাগল চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে।

একটি পরিসংখ্যান দিলে বোঝা যায় যে গত দশ বছরে ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যায় সুবর্ণরেখা নদী অঞ্চলে মাছের উৎপাদন সাধারণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যদিও পরিবেশগত সমস্যাগুলি বিদ্যমান। উড়িষ্যায় মানুষের উন্নয়নের জন্য প্রত্যক্ষ সরকারি বিনিয়োগের ফলে মৎস্যচাষ প্রযুক্তির উন্নতি হয়েছে। গত ৪ বছরে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ৪০ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে যেখানে সুবর্ণরেখা নদী বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে, সেখানে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির ইতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, অন্যক্ষেত্রে তা আশানুরূপ নয়।

ঝাড়খণ্ডে সুবর্ণরেখা নদীর তীরবর্তী মাইনিং এবং বিভিন্ন শিল্প কারখানা থেকে সৃষ্ট দূষণের কারণে মৎস্য উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। তবে পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মাছের উৎপাদনে উপর যেমন প্রভাব ফেলে তেমনি এই সংক্রান্ত জীবিকার উপরও তা নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। তাই সমীক্ষা থেকে দেখা যায়, এই পেশায় নিযুক্ত লোকজন তাদের জীবন জীবিকার নিশ্চয়তা না থাকায় তারা তাদের নতুন প্রজন্মদের গতানুগতিক পেশার বাইরে অন্য কিছু যেমন—নির্মাণ কার্যে, কাঠের ফার্নিচারের কাজে, বার্ণিশ শিল্পে নিযুক্ত করে।

এরপর আসা যাক, সুবর্ণরেখা নদীর মাছের বৈচিত্র্যে। সমীক্ষায় দেখা যায় গত ১০-১৫ বছর আগে নদীবক্ষে যে সমস্ত মাছের প্রজাতি পাওয়া যেত তার পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাচ্ছে বিভিন্ন প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট কারণে।

সমগ্র সুবর্ণরেখা নদীর মাছের প্রাচুর্য ঘাটতির মূল কারণগুলি হল— কৃষিকার্যে অধিক কীটনাশক ব্যবহার, প্লাস্টিক বা শিল্পদূষণ, হ্যাবিটেট ফ্র্যাগমেন্টেশন, বিদেশী মাছের অনুপ্রবেশ এবং সর্বোপরি পরিবেশ সম্পর্কে মানুষের যথেচ্ছ সচেতনতার অভাব।

এই নদীতে যে সমস্ত মাছের সন্ধান পাওয়া যায় তা হল, সরপুটি, দারকনে (দাঁড়িয়া), চাঁদা, খলসে, ট্যাংরা, মৌরলা, পাঁকাল, ন্যাদোশ, শোল, শাল প্রভৃতি দেশীয় ছোট মাছ এবং রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবোস, গ্রাসকার্প, পাবদা, মাগুর প্রভৃতি মিষ্টি জলের কার্প জাতীয় মাছ। এছাড়া সামুদ্রিক অস্থিযুক্ত এবং তরুণাস্থি যুক্ত মাছ যেমন— ইলিশ, ফ্যাসা, গুড় জালি, রূপালি ফিতা মাছ অর্থাৎ রিবন মাছ, বম্বে ডাক্ট, পমফ্রেট প্রভৃতি অস্থিযুক্ত মাছ এবং সার্ডিন, সার্ক, করাতমাছ, স্কেটস, ইলেকট্রিক রে ফিস প্রভৃতি।

এই সমস্ত নদীমাতৃক দেশীয় ছোট বড় মাছ গ্রামবাংলার বা শহরের মানুষের অতি প্রিয় খাদ্য। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এসব ছোট বড় মাছের খাদ্যগুণ সম্পর্কে কেউ অবগত নয়। ছোট দেশীয় মাছগুলি প্রোটিন, ভিটামিন, বিভিন্ন খনিজ (আয়রন, ক্যালসিয়াম, আয়োডিন ইত্যাদি) সমৃদ্ধ, যা আমাদের পুষ্টি বৃদ্ধির সাথে সাথে বিভিন্ন রোগের প্রকোপ থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করে।

এই সমস্ত দেশীয় মাছগুলির সংখ্যা ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে

যাচ্ছে উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে। এক্ষেত্রে উন্নত কৃষি বা মৎস্য চাষ অনেকাংশে দায়ী।

বর্তমানে নদীতে উপযুক্ত পরিমাণ মাছ হারভেস্টিং না হওয়ার কারণে এবং মৎস্যজীবী পরিবারগুলির বাৎসরিক আয় খুব নিম্নমুখী অর্থাৎ বাৎসরিক ৬০-৮০ হাজার , যা সত্যিই খুব হৃদয়বিদারক, তাদের গড় সদস্য সংখ্যা ৫-৬ জনের ক্ষেত্রে খুবই হতাশাব্যঞ্জক। তাই মৎস্যজীবী পরিবারের তরুণ প্রজন্ম বাধ্য হয়ে তাদের পরিবারের গতানুগতিক জীবিকা ছেড়ে বিকল্প জীবিকার সন্ধান খোঁজে। ভবিষ্যতের জন্য এটা এক অশনি সংকেত বহন করে।

একটি বিষয় লক্ষণীয় যে মাছ হারভেস্টিং-এর জন্য যে সমস্ত উপকরণ ব্যবহার করা হয়—নৌকা বা ডিঙ্গি, বেহুন্দী জাল, ব্যাগ জাল, টানা জাল, কাস্ট বা ফিকা জাল, খাপলা জাল, চীনা জাল (বড় জাল নদীতে স্থায়ীভাবে স্থাপন করা হয়), ট্রাপ বা ফাঁদ (বাঁশের নির্মিত, যা নদীতে স্থাপন করলে মাছ এর ভেতরে প্রবেশ করে) এবং পরিশেষে হুক বা লাইন, যা বঁড়শি নামেও পরিচিত। সাধারণত বড় মাছ ধরার জন্য বর্ষাকালে জল বেশি থাকলে ব্যবহৃত হয়। ভীষণ দামী, যা দরিদ্র মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের পক্ষে সংসার চালিয়ে কেনাটা খুবই কষ্টসাধ্য। তাই তারা ধনী লোকদের কাছ থেকে চড়া সুদে দাদন নিয়ে পেশাটাকে চালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। তবে বর্তমানে কিছু মৎস্য সমবায় বা সরকারের বা এনজিও-র আর্থিক সহায়তায় জীবনে কিছুটা আশার আলো দেখে।

ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে আরো জানতে পারা যায়, যে সমস্ত মৎস্যজীবীরা মূলত নদীর মাছের উপর নির্ভরশীল হয়, তারা সর্বসাকুল্যে বছরে ৬ মাস অর্থাৎ জানুয়ারি-জুন মাস অবধি মাছে আহরণ করে এবং বাকি ৬ মাস অর্থাৎ বর্ষা এবং প্রাক্-বর্ষায় তারা কর্মহীন হয়ে পড়ে। তখন ঐ সমস্ত পরিবারের সদস্যরা বিকল্প কাজে যেমন বাবুই ঘাসের দড়ি বা বিচুলি পাকানোর কাজে, শাল বা কেন্দু পাতা বিক্রি করা, বা হাঁস, মুরগি প্রতিপালনের কাজ করে।

**সামাজিক অবস্থা**

শিক্ষা ও সচেতনতা: মৎস্যজীবী পরিবারগুলির শিক্ষার হার খুবই হতাশাব্যঞ্জক। অর্থনৈতিক কারণে পরিবারের অনেক শিশুই প্রাথমিক শিক্ষার পর স্কুল ছেড়ে দেয়।

স্বাস্থ্যসেবা: গ্রামীণ এলাকায় স্বাস্থ্য পরিষেবা মোটামুটি সন্তোষজনক। তবে অপর্যাপ্ত স্যানিটেশন ব্যবস্থা বা মশারিবিহীন নিদ্রা বা অপরিশোধিত পানীয় জল ঝুঁকি বাড়ায়।

নারীদের ভূমিকা: পরিবারের নারীরা গৃহকর্ম, বাচ্চাদের লালন পালন, মাছ বাছাই বা মাছ ধরার কাজে পুরুষ সঙ্গীদের সাহায্য করে ও বিক্রি কাজেও সাহায্য করে।

সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য: এদের নিজস্ব লোকসংস্কৃতি, নৃত্য ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কার্যক্রম রয়েছে যা তাদের জীবনের অংশ।

মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের উন্নয়নে পরিবেশগত বাধা—

১. জলবায়ুগত পরিবর্তন : জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়। ফলে মাছের জীববৈচিত্র্যে পরিবর্তন ঘটে। ফলে মৎস্যজীবীদের জীবন আরো কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে ওঠে।

২. দূষণ ও নদীর অবক্ষয় : শিল্প ও অন্যান্য দূষণ নদীর মাছের উপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে যা মৎস্যজীবীদের আয়ের প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায়।

৩. সচেতনতার অভাব : শিক্ষার অভাব মানুষকে সচেতনতার জায়গা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, ফলে কখনও কখনও নেমে আসে জীবনের কঠিন বিপর্যয়।

তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা যায়, সরকার এবং বিভিন্ন এনজিও সংস্থা এই মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নানান ছোট বা বড় উদ্যোগ গ্রহণ করে চলেছে। এতে প্রত্যেক পরিবারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিকতা ও প্রশিক্ষণের মান বজায় থাকে।

এছাড়া নিজস্ব কিছু মৎস্যজীবী সমবায় ও মাইক্রো-ফাইনান্স সুবিধা প্রদান করে যা তাদের জীবনযাত্রার মান কিছুটা উন্নত করতে সাহায্য করে। তাই এই পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়ানো আমাদের প্রত্যেকের নৈতিক কর্তব্য। কারণ এদের উপরই নির্ভর করে ভারতের মতো দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় করার ভার।

উমা

# অনুপম মিশ্র

## সঞ্জয় অধিকারী

শ্রী অনুপম মিশ্র, এই অত্যন্ত সহজ, সরল, নম্র, বিনয়ী মানুষটির জন্ম ভারত স্বাধীন হওয়ার পরের বছর, মধ্যপ্রদেশের ওয়ার্ধাতে, ১৯৪৮ সালে। মা সরলা মিশ্র। বাবা বিখ্যাত কবি ভবানীপ্রসাদ মিশ্র। তাঁদের দুই ছেলে, দুই মেয়ে। সবার বড় দাদা শ্রী অমিতাভ মিশ্র। অমিতাভের বোন নমিতা ও নন্দিতা। অনুপমজীর জীবন শুরু হয় ওয়ার্ধাতে। ডাক নাম ছিল পমপম। সেই পমপম ওয়ার্ধা থেকে হায়দ্রাবাদ। হায়দ্রাবাদ থেকে বেমেতরা (এখন ছত্তিশগড়)। ১০ বছর বয়সে দিল্লি এসে আমৃত্যু এখানেই থেকে গেলেন। তাঁর আসল পরিচয় হল তিনি একজন আপাদমস্তক বড় মনের এবং বড় মাপের মানুষ। তিনি কাজের মধ্যে দিয়ে অগণিত বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-পরিজনদের সঠিক পথের দিশা দেখিয়ে চিরকালীন হয়ে থেকে গেছেন।

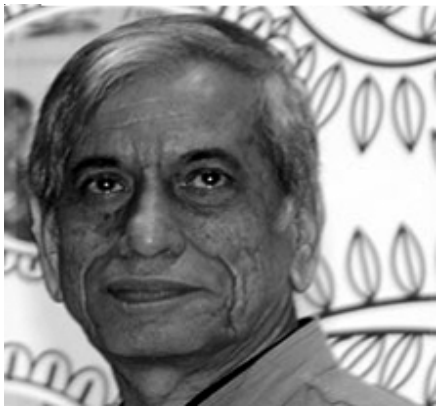

আমার কাছে অনুপম মিশ্র আর পরিবেশ সমার্থক। ৫ জুন তাঁর জন্মদিন, সেই দিনটিই হল বিশ্ব পরিবেশ দিবস। ১৯৬৯ সালে সংস্কৃতে এম এ পাশ করার বছরেই তিনি যুক্ত হন গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠানে। প্রখ্যাত সাংবাদিক প্রভাস জোশীর তত্ত্বাবধানে শুরু করেন প্রকাশনার কাজ।

অনুপমজী ১৯৭৩ সালে চলে গেলেন রাজস্থানের চম্বলে। জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে কিশোর অনুপম মিশ্র পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করলেন। মিলিত হলেন বহু মানুষের সাথে, মাটির সাথে, গাছের সাথে। তাদের জড়িয়ে ধরলেন। অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হলেন। ১৯৭৭-এ আবার ফিরে এলেন গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠানে। মনের মধ্যে চিন্তার কুঁড়িগুলো পাপড়ি মেলছে। সৌরভ ছড়াতে চাইছে কলমের হাত ধরে। ১৯৭৮ সালে হিন্দি ভাষায় প্রকাশিত হল 'চিপকো'। শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ ত্রিপাঠী বইটি পড়ে এতটাই প্রভাবিত হলেন যে, তাঁর মনে হল বইটির ইংরাজি অনুবাদ হওয়া একান্তই জরুরি। যেমন মনে হওয়া, তেমন কাজ।

অনুপমজীর স্ত্রী মঞ্জু ভাবীর কথা অনুযায়ী জলের কাজে মন দেন ১৯৮০ সালে রাজস্থান থেকে। এই কম বৃষ্টিপাতের রাজ্যটির অদ্ভুত জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা কোনো এক অদৃশ্য টানে তাঁকে বার বার টেনে নিয়ে যেত রাজস্থানে। প্রায় ১০-১২ বছর বার বার সেখানে গিয়ে, সেখানকার মানুষের সঙ্গে কথা বলে, নিরন্তর গবেষণার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করলেন এক অনন্য সাধারণ ভারতীয় জল সংরক্ষণের ঐতিহ্যবাদী দলিল, 'আজ ভি খরে হৈ তালাব'। বইটি পাঞ্জাবি, মারাঠী, উর্দু, গুজরাটি, কন্নড়, ইংরেজিতে অনুবাদ করলেন নিরুপমা অধিকারী। প্রচ্ছদটি তৈরি করে দেন ভারতবিখ্যাত স্বনামধন্য শিল্পী শ্রী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুপমজীর এই বই অনেকের কাছে গেলেও, মেনে নেওয়া ভাল এখনো সকলের কাছে পৌঁছায় নি। দায়ভার তাঁর নয়, অবশ্যই আমাদের।

তাঁর পরিবেশ সচেতনতা ও বোধ তাঁকে গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠানের হয়ে ১৯৮২ সালে নাইরোবি পরিবেশ সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ এনে দেয়। আর এর মাত্র কয়েক বছর পরই তাঁর কলম থেকে জন্ম নিল দুটি পরিবেশ বিষয়ক বই— 'দেশের পরিবেশ' (১৯৮৬) এবং 'আমাদের পরিবেশ' (১৯৮৮)। অনুপমজী মনে করতেন পরিবেশ সম্পর্কে আমাদের সচেতনতা বাড়ছে না বরং কমছে। অনেকে বলতে পারেন বাড়ছে, কিন্তু কোনো ফলাফল কোথাও দেখা যায় না।

১৯৫৫ সালে তাঁর কলম থেকে বেরোল আরো একটি হীরক খণ্ড, 'রাজস্থানকে রজত বুঁদে'। জল সঞ্চয় ও সংরক্ষণের ওপর। নামের থেকেই পরিষ্কার এবারও রাজ্যটি রাজস্থান। কিন্তু রাজস্থান যা পারে, অন্যরা তা পারবে না কেন? এর উত্তর কে দেবে? ২০০৩ সালে ভারতীয় ভাষা পরিষদ এই বইটির একটি বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেছিল। শ্রীযুক্ত কল্যাণ রুদ্রের ভাষায়—'ভাষান্তরের দায় বহন করেছিলেন নিরুপমা অধিকারী'।

অনুপমজী ১৯৭৭ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত ছোট বড় মিলিয়ে মোট ১৭টি বইয়ের খাজানা আমাদের জন্য তৈরি করেন। দুঃখের বিষয় তিনি যেমন এখনো অনেকের কাছেই অচেনা,

তেমনি তাঁর অনেক বই-ই এখন আর ছাপার অক্ষরে পাওয়া যায় না।

অবশ্য এরপরও বেরোয় তাঁর অনেক লেখা। যেমন—'গোচরকা প্রসাদ বাঁটতা লাপোডিয়া'। নিরুপমা আবার অনুবাদ করেন বাংলায়—'লাপোডিয়া' নামে। ২০১১ সালে নিউ দিল্লির গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত পত্রিকা 'গান্ধীমার্গ'-র নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়—'না যা স্বামী পরদেশা'র মতো লেখা। স্বভাব অনুযায়ী, বাংলায় নিরুপমার অনুবাদ—'যেও না তুমি পরদেশ' নামে। নিরুপমা বলেছেন অনুপমজীর প্রতিটি বইয়েই দেখতে পাওয়া যায় 'শব্দ চয়নের মগ্নতা'। তাঁর লেখা বইগুলি পড়তে পড়তে আমরা পৌঁছে যায় এক ভিন্ন জানা অথচ অজানা-অনাস্বাদিত-অমৃতময় জগতে।

অনেকেই অনুপমজীর সঠিক মূল্যায়ন করতে না পারলেও ২০১১-তে শিল্পীদের দেশ বলে খ্যাত ফ্রান্স, সেখানের পঁপদ্যুতে বিশ্ব সমকালীন শিল্প সংগ্রহশালা এবং আমেরিকার ক্যানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুপমজীর ভাষণের ব্যবস্থা করে। শুনলে গল্পের মতো মনে হলেও সেই ভাষণের নির্যাস থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আফ্রিকান দেশ, মরক্কোতে জলের কাজ শুরু করেন সেখানকার মানুষজন। তাঁরা শুধু শুরুই করেন না, এই পদ্ধতি অত্যন্ত আনন্দ চিত্তে গ্রহণও করেন।

এখানেই শেষ নয়। যাঁরা অনুপমজীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁরা জানেন তিনি কথায়, কাজে বিশ্বাসী ছিলেন। অনুপমজী 'লেকচার দেওয়া'র ঘোর বিরোধী ছিলেন। লিখতেন, কাজ করতেন, কম কথা বলতেন। তবে পরে তিনি বাধ্য হন কথা বলতে, তাঁর ভাবনা বক্তব্যের মাধ্যমে প্রাঞ্জলভাবে অন্যদের কাছে পৌঁছে দিতে। ১৯১৩ সালে একটি অনুষ্ঠানে নিজের কাজ ও ভারতীয় জল সংস্কৃতির পরম্পরা নিয়ে উচ্চারণের স্পষ্টতা দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছিলেন ছবি, দেখাচ্ছিলেন রাজস্থানের অভূতপূর্ব জল সংরক্ষণ শৈলী। সেই কথা বলা ও বোঝানোর অনুষ্ঠানে সেবার উপস্থিত ছিলেন চীন দেশের এক ছাত্র। তিনি মন্ত্রমুগ্ধ, জ্ঞানশূন্য হয়ে দেখছিলেন ও শুনছিলেন। তারপর শব্দ যখন থামল, মাটিতে ফিরে এলেন। তিনি অনুপমজীর কাছে অনুমতি চেয়ে নেন নিজের দেশে এইসব ছবির প্রদর্শনী করতে। অনুপমজী সানন্দে অনুমতি দিলেন এবং এ ব্যাপারে সেই চীন দেশের ছাত্রটিকে উৎসাহিত করলেন। এরপর ইতিহাস। তিনি হুনানে এক সোশ্যাল ইনস্টিটিউট-এ শুরু করলেন রাজস্থানের জল সংরক্ষণের পদ্ধতি নিয়ে প্রদর্শনী। একমাস ব্যাপী চলে সেই প্রদর্শনী। হুনানে প্রদর্শনী শেষ হওয়ার পরেই শুরু হয় চিনের অন্যান্য শহরে এই ফটোগ্রাফগুলো দেখানো।

অবশ্য এর অনেক আগেই অনুপমজী যাঁরা পরিবেশ নিয়ে কাজ করেন, সেইসব বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাথে যুক্ত হন। যেমন লন্ডনে 'পেনাল্স'।

এতদূর পড়ার পর অনেকের মনে হতেই পারে ভারতের রাজস্থান, দিল্লি এবং বিদেশেই ছিল তাঁর কর্মক্ষেত্র। না, তা একেবারেই নয়। তিনি বিভিন্ন সময় ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এবং বিভিন্ন জেলায় গেছেন। তার মধ্যে অবশ্যই কলকাতা এবং পুরুলিয়াও আছে। যখন পুরুলিয়ায় জল নিয়ে কথা বলা জন্য এসেছেন তখন বিজ্ঞান মিউজিয়ামেও তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। ঘরভর্তি পুরুলিয়ার লোকজনের সামনে প্রোজেক্টরে দেখিয়েছেন তাঁর কর্মকাণ্ডের ধারা। সেখানে ছিলেন পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রী বিনায়ক ভট্টাচার্য, ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলোকচিত্রী শ্রী সন্তোষ রাজগোড়িয়া এবং বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব।

সুবিখ্যাত হলেও অনুপমজী মানুষটি থাকতেন একেবারে অনাড়ম্বরভাবে। পুরুলিয়ায় এসে তিনি নিরুপমা অধিকারীর বাড়িতে থেকেছেন, খেয়েছেন। তাঁর পরিবারেরই একজন মনে করতেন তাঁকে। শ্যাম অবিনাশের বাড়িতেও থেকেছেন। যে বা যাঁরাই জল নিয়ে কাজ করতেন তিনি মনে করতেন তাঁরা সকলেই এক পরিবারের মানুষ। কর্মকাণ্ডে মহান হলেও জীবনধারায় ছিলেন অত্যন্ত সহজ সরল। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত কখনো মুঠোফোন ব্যবহার করেননি। মানুষ ভালবাসতেন, ছিলেন অত্যন্ত অতিথি বৎসল। কেউ খাবার নষ্ট করলে খুবই বিরক্ত হতেন। বাড়িতে কেউ গেলে সবসময় দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেওয়াটা ছিল স্বাভাবের মধ্যে। আর ছিল তাঁর অননুকরণীয় সৌন্দর্যবোধ। সামান্য একটা চিঠি পাঠালেও তাতে থাকত তাঁর শৈল্পিক ছোঁয়া। ঈর্ষণীয় ছিল তাঁর সময়ানুবর্তিতা ও নিয়মানুবর্তিতা।

পুরুলিয়া, কলকাতা, দিল্লি, তাঁর অফিস বাড়িতে দেখা করে এবং তাঁর সঙ্গে থেকে একটাই কথা মনে হয়েছে— If you judge, you have no time to love. তুমি যদি মানুষকে, পরিবেশকে, প্রকৃতিকে বিচার আর বিশ্লেষণই করে যাবে তাহলে ভালো কখন বাসবে?

অনুপমজী প্রকৃতির নিয়মগুলোকে বোঝার চেষ্টা করতেন, সেগুলির বিচার করে সকলের সামনে নিজের মতো করে অর্থাৎ জলের মতো বিতরণ করতেন। আমাদের ঐতিহ্যকে এমনভাবে পরিবেশন করতেন, যাতে আমরা আত্মস্থ করতে পারি। তিনি ছিলেন প্রকৃতিপ্রেম, দেশপ্রেম, বীরপ্রেম এবং মানবপ্রেমে বিলীন হয়ে যাওয়া এক মহামানব।

উ মা

উৎস মানুষ WB/EC 228 ISSN 0971-5800 RN. 37375/80 Rs. 30.00
৪৪তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪ ৩০.০০ টাকা

উৎস মানুষ পত্রিকা ও প্রকাশনার বইয়ের জন্য যোগাযোগ— সুমন্ত বিশ্বাস।
ফোন— ৯৪৩৩৭৭১৫৭৭/৯১৪৩৭৮৬১৩৪

উৎস মানুষ পত্রিকা ও প্রকাশনার বইগুলি অনলাইনে অর্ডার দিলে পাওয়া যায়। যোগাযোগ—হারিত বুকস (অনলাইন) **haritbooks@gmail.com**
হারিতের ফোন নং — +৯১ ৮৩৩৬৯৪১১০৮

গ্রাহক চাঁদা (বাৎসরিক) ১৫০ টাকা (চারটি সংখ্যার জন্য) উৎস মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়া যায়। স্পিড পোস্টে নিলে ২২০ টাকা জমা দিতে হবে।

**Punjab National Bank,**
**College Street Branch,**
**Kolkata - 700073.**
**UTSA MANUSH, SB ACCOUNT NO. 0083010748838. IFSC NO. PUNB0058400**

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দিয়ে ফোনে বা ই-মেলে নাম, ঠিকানা, পিনকোড, ফোন নং ও ই-মেল দেবেন আর কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হবেন তা জানাবেন। সাধারণ ডাকে পত্রিকা পাঠানো হয়। ডাকে পত্রিকা না পেলে আমরা সংখ্যাটি দ্বিতীয়বার পাঠাতে পারব না। গ্রাহক নবীকরণ একইভাবে করা করা হয়।

ওয়েবসাইট : **https://www.utsomanush.com**
ই-মেল : **utsamanush1980@gmail.com**
**Facebook : https://www.facebook.com/**

## পুস্তক তালিকা

| | |
|---|---|
| জল-জমি-জঙ্গলের খোঁজে: | |
| বোলান গঙ্গোপাধ্যায় | ১৫০.০০ |
| স্বাস্থ্যের সাতকাহন : গৌতম মিস্ত্রী | (১ম খণ্ড যন্ত্রস্থ) |
| আসুন কাণ্ডজ্ঞানে ফিরি: আশীষ লাহিড়ী | ৮০.০০ |
| চেনা বিষয় অচেনা জগৎ: সমীরকুমার ঘোষ | ১৫০.০০ |
| বাঁধ বন্যা বিপর্যয় (সংকলন) | ২০০.০০ |
| আহরণ (সংকলন) | ২০০.০০ |
| যে গল্পের শেষ নেই: দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় | ১৫০.০০ |
| প্রতিরোধ : সম্পা: (ঐ) | ১৩০.০০ |
| বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান (সংকলন) | ২০০.০০ |
| বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ (সংকলন) | ১৫০.০০ |
| বিবেকানন্দ অন্য চোখে/সমীক্ষা ও আরো কিছু বিতর্ক | |
| নিরঞ্জন ধর | ১২০.০০ |
| প্রমিথিউসের পথে (সংকলন) | ৫০.০০ |
| লেখালিখি: অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় | ২০০.০০ |
| যুক্তিবাদের চার সেনাপতি | |
| অনু : প্রতুল মুখোপাধ্যায় | ৬০.০০ |
| শেকল ভাঙা সংস্কৃতি (সংকলন) | ১২০.০০ |
| গুমোট ভাঙ্গার গান: ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ | ১৫০.০০ |
| নিজের মুখোমুখি: রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য | ৫০.০০ |
| এটা কী ওটা কেন (সংকলন) | ৫০.০০ |
| মূল্যবোধ (সংকলন) | ৮০.০০ |
| প্রেসিডেন্ট বুশ-এর এই যুদ্ধ: | |
| অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় | ৩০.০০ |
| বাংলা বন্ধ বা শেষের শুরু: | |
| হিমানীশ গোস্বামী | ৪০.০০ |

প্রাপ্তিস্থান : পাতিরাম, সেতু প্রকাশনী, ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, অমর কোলে (বিবাদী বাগ), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজ স্ট্রীট), ক্রান্তিক (কলেজ স্ট্রীট), রথীনদা (গোলপার্ক). ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (সূর্য সেন স্ট্রীট) । জ্ঞান বিচিত্রা ১৮বি/১বি, টেমার লেন। প্রতিক্ষণ, ৫ সূর্য সেন স্ট্রীট।
হারিত বুকস (অনলাইন) **haritbooks@gmail.com**

উৎস মানুষ সোসাইটির পক্ষে বরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০ ০৬৪ থেকে প্রকাশিত এবং দি নিউ জয়কালী প্রেস, ৮এ, দীনবন্ধু লেন, কলকাতা- ৭০০ ০০৬ হইতে মুদ্রিত।